ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য

Recommended by the West Bengal Board of Seeondary Education as a Text Book for Class VIII Vide Notification No. 76/8/TB/17 dated 27. 12 76

সাহিত্য মুকুলিকা

[অষ্টম শ্রেণীর বাংলা গদ্য ও পদ্য সংকলন]

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এম্. এ., পি. এইচ্. ডি.
প্রধান অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, জয়পুরিয়া কলেজ
(নৈশ বিভাগ), কলিকাতা

ও

অঞ্জলি ভট্টাচার্য এম্. এ., বি. টি.
শিক্ষিকা, সেণ্ট্ মার্গারেট্স্ স্কুল, কলিকাতা।

পঞ্চম মুদ্রণ : আগস্ট, ১৯৮৫

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নতুন সিলেবাস্ বা পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এই সংকলন। বিভিন্ন গদ্য ও পদ্যাংশ নির্বাচনে সিলেবাস্-এর দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হয়েছে; বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে যেমন, শ্রেষ্ঠ লেখকদের উপরেও তেমনি সাধ্যমত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ এক দুরূহ কাজ,—একদিকে বিষয়-নির্বাচন, অন্যদিকে লেখক-মনোনয়ন। এ-কাজে কতদূর সফল হয়েছি, তা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকরাই বিচার করবেন। এছাড়া, ছাত্রছাত্রীদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগার উপরেও এর অগ্নিপরীক্ষা। শুধু এটুকু বলতে পারি, চেষ্টার ত্রুটি করিনি।

পদ্যাংশে প্রখ্যাত কবিদের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা সংকলিত। গদ্যাংশে শ্রেষ্ঠ লেখকদের সাধু ও চলিত উভয় রীতির রচনাই স্থান পেয়েছে। প্রতিটি রচনার প্রারম্ভে লেখক-পরিচিতি ও রচনার উৎস-নির্দেশ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী। লেখক ও রচনা-পরিচিতি এবং শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী অংশ ছাত্রছাত্রীদের কাজে লাগবে, আশা করি।

এ-সংকলনের প্রতিটি পাঠই নাতিদীর্ঘ। সে-তুলনায় অনুশীলনী অংশ বিস্তৃত। অনুশীলনীর শেষে মৌখিক প্রশ্নাবলী সংযোজিত। এ-সকল প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে বলেই বিশ্বাস।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৭৫
প্লট নং এ বি ১৭৫
সল্ট্ লেক সিটি
কলিকাতা-৭০০ ০৬৪

নিবেদক,
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
অঞ্জলি ভট্টাচার্য

বাংলার পাঠ্যসূচী

প্রথম ভাষা

অষ্টম শ্রেণী

একটি পত্র—পূর্ণ সংখ্যা ১০০

(লেখ্য বিষয় ৯০+মৌখিক ১০)

১। পাঠ্য গ্রন্থ	(ক) গদ্যাংশ	২০
	(খ) পদ্যাংশ	২০
২। ব্যাকরণ		২০
৩। প্রবন্ধ এবং পত্রলিখন/গল্পরচনা		২০ (১২+৮)
৪। সহায়ক পাঠ		১০
৫। মৌখিক		১০
		১০০

১। গদ্যাংশ-পদ্যাংশ সম্বলিত একখানি পাঠ্যপুস্তক থাকিবে। বিষয়বস্তু সপ্তম শ্রেণীর অনুযায়ী, অর্থাৎ, গদ্যাংশের মধ্যে থাকিবে (ক) নানান সাহিত্যিক বিষয়—প্রাকৃতিক দৃশ্য, গল্প, স্মৃতিচারণ, ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি, (খ) স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক বিষয় (দেশীয় কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি ও জাতীয় গৌরব বিষয়ক রচনা), (গ) জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবন-বৃত্তান্ত ও সংগ্রামের কথা (সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মুখ্যতঃ উনবিংশ শতক হইতে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সময়ের কথা), (ঘ) মহৎ-জীবনকথা (সর্বভারতীয় মহাপুরুষদিগের জীবন-বৃত্তান্ত), (ঙ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অভিযান এবং (চ) একটি নাট্যাংশ। তদুপরি জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের জীবনী ও সংগ্রাম বিষয়ে রচনা থাকা বাঞ্ছনীয় ("পলাশীর যুদ্ধ" ; "সিপাহী বিদ্রোহ" এবং উহা হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কার ঘটনাবলী অবলম্বনীয়) ; পদ্যাংশের জন্য প্রসিদ্ধ কবিগণের বিভিন্ন ভাব ও ছন্দের কবিতা সংকলন করিতে হইবে। গদ্য ও পদ্যের মান পূর্বাপেক্ষা (অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণী অপেক্ষা) উচ্চতর হইবে। গদ্যাংশে সাধু ও চলিত উভয় রীতির রচনা থাকিবে। পাঠগুলি প্রসিদ্ধ লেখকগণের রচনা হইতে সংকলিত হইবে। সংকলকের নিজস্ব রচনাও থাকিতে পারে। পাঠগুলি যেন নাতিদীর্ঘ হয়। বিস্তৃত অনুশীলনী থাকা বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থের আকার ২২″ × ৩২″ (১/১৬)। টাইপ স্মল পাইকা। ২৪ এম্। পৃষ্ঠা গদ্যাংশের জন্য ৬৫+পদ্যাংশের জন্য ৩৫, মোট ১০০। অনুশীলনীর জন্য অতিরিক্ত ৮ পৃষ্ঠা যোগ করা চলিবে।

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

॥ ছাত্রদের প্রতি ॥

তোমাদের এই বিদ্যামন্দিরে এসে আমার নিজের অধ্যয়ন-জীবনের কথাই আজ বারবার করে মনে পড়ছে। আমারও একদিন তোমাদের মতই উচ্চশিক্ষার আশা নিয়ে এমনি করে ছাত্রজীবন সুরু হয়েছিল, সেদিন মনে মনে ভাবীকালকে স্মরণ করে কত আশার মুকুলই না রচনা করেছিলাম! কিন্তু স্বপ্ন যত বড় ছিল, পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য থেকেও ঠিক ততখানিই বঞ্চিত হলাম। বিধাতা যে এমন বঞ্চনা আমার জন্য রেখেছিলেন, ভাবতে পারিনি। বিদ্যামন্দিরের উদ্দেশে দূর থেকে নমস্কার জানিয়েই একদিন ভবঘুরে হলাম। এমনি করেই আজ জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় এসে পৌঁছেচি। এ জীবনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি, সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ফাঁকি দিয়ে মানুষের চোখ ঝলসাতে গেলে সে-ফাঁকি এক সময় নিজেকে এসেই বেঁধে। তোমাদের তাই বলবো—অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমাদের সামনে, তোমাদের দিয়ে দেশ একদিন বড় হবে। তোমরা তাই খাঁটি হও। চোখে দেখে যা পরখ করবে না, জীবনে তাকে কখনও সত্য বলে প্রচার করবে না, তাতে ঠকতে হয়। তোমরা আমার ভালবাসা নাও।*

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

---

* রাজেন্দ্র কলেজে প্রদত্ত ভাষণ
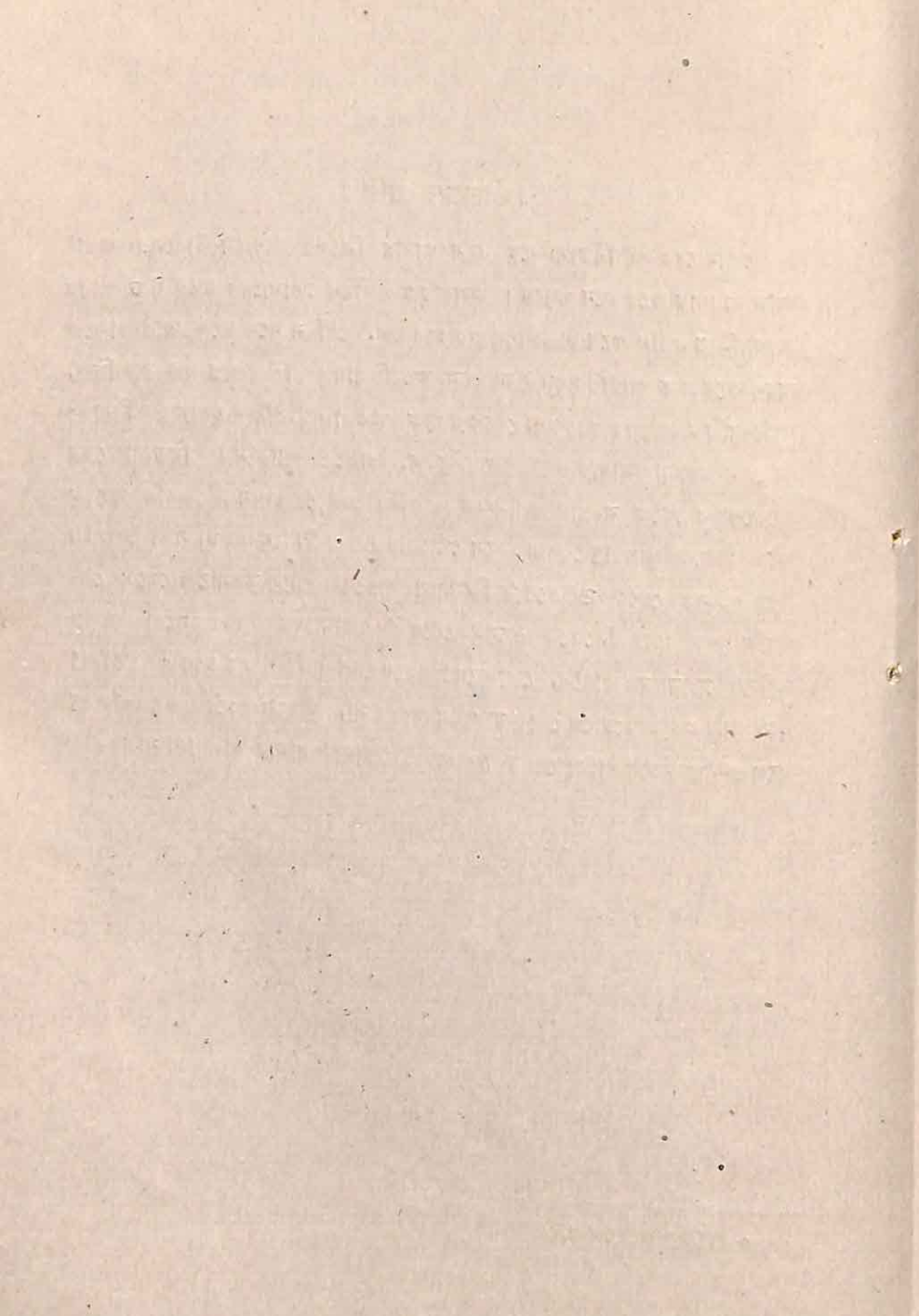
পলাশীর যুদ্ধ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রীঃ) এদেশের এক প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। শিক্ষা-বিস্তার, সমাজ-সংস্কার ও সাহিত্য-সেবার মধ্য দিয়ে তিনি দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ-সাধন করেছেন। উদ্ধৃত রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের লেখা 'বাঙ্গালার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ' (১৮৪৮ খ্রীঃ) থেকে গৃহীত। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' জন ক্লার্ক মার্শম্যান-এর 'Outlines of the History of Bengal for the use of Youths in India' নামক গ্রন্থের শেষ নয়টি অধ্যায় (একাদশ থেকে ঊনবিংশ) অবলম্বনে লিখিত। তবে গ্রন্থটির হুবহু অনুবাদ বিদ্যাসাগর করেন নি, ভাবানুবাদ করেছিলেন। এখানে, অর্থাৎ সংকলিত এই রচনাংশটিতে পাওয়া যাবে পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনা।]

১৯শে জুন, ঘোরতর বর্ষার আরম্ভ হইল। ক্লাইব, নদী পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করি, কি ফিরিয়া যাই, মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি তৎকাল পর্যন্ত মীর-জাফরের কোনও উদ্দেশ পাইলেন না, এবং তাঁহার একখানি পত্রিকাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি, স্বীয় সেনাপতিদিগকে সমবেত

করিয়া, পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। ক্লাইবও, প্রথমত তাঁহাদের সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু, পরিশেষে, অভিনিবেশপূর্বক বিবেচনা করিয়া, ভাগ্যে যাহা থাকে ভাবিয়া, যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, যদি এতদূর আসিয়া, এখন ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে, বাঙ্গালাতে ইংরেজদিগের অভ্যুদয়ের আশা একেবারে উচ্ছিন্ন হইবেক।

২২শে জুন, সূর্যোদয় কালে, সৈন্যসকল গঙ্গা পার হইতে আরম্ভ করিল। দুই প্রহর চারিটার সময়; সমুদয় সৈন্য অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। তাহারা, অবিশ্রান্ত গমন করিয়া রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়, পলাশীর বাগানে উপস্থিত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্লাইব, উৎকণ্ঠিত চিত্তে মীরজাফরের ও তদীয় সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তখন পর্যন্ত, তাঁহার ও তদীয় সৈন্যের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া, সকলের পশ্চাদ্ভাগে তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। মীরমদন নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফর, আত্মসৈন্য সহিত, তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময়, কামানের গোলা লাগিয়া, সেনাপতি মীরমদনের দুই পা উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে নীত হইলেন, এবং তাঁহার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দৃষ্টে নবাব যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং ভৃত্যদিগকে বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন, তিনি মীরজাফরকে

ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার চরণে স্বীয় উষ্ণীষ স্থাপিত করিয়া, অতিশয় দীনতা প্রদর্শনপূর্বক এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, অন্ততঃ আমার মাতামহের অনুরোধে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, এই বিষম বিপদের সময় সহায়তা কর।

জাফর অঙ্গীকার করিলেন, আমি আত্মধর্ম প্রতিপালন করিব; এবং, তাহার প্রমাণস্বরূপ, নবাবকে পরামর্শ দিলেন, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সৈন্য সকল ফিরাইয়া আনুন। যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন, কল্য আমরা, সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইব। তদনুসারে, নবাব সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার আজ্ঞা পাঠাইলেন। নবাবের অপর সেনাপতি মোহনলাল ইংরেজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু নবাবের এই আজ্ঞা পাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক নিবৃত্ত হইলেন। তিনি অকস্মাৎ ক্ষান্ত হওয়াতে, সৈন্যদিগের উৎসাহভঙ্গ হইল। তাহারা, ভঙ্গ দিয়া, চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং ক্লাইবের অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক না হইতেন এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইবের, কোনও ক্রমে, জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর, সিরাজউদ্দোলা, এক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, দুই সহস্র অশ্বারোহ সমভিব্যাহারে, সমস্ত রাত্রি গমন করতঃ, পরদিন বেলা ৮টার সময়, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়াই আপনার প্রধান প্রধান ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে সন্নিধানে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল।

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

১৯শে জুন—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন। আন্দোলন—বিচার।
পত্রিকা—লিপি, চিঠি অভিনিবেশপূর্বক—মনোযোগ সহকারে।
অভ্যুদয়—উন্নতি, সমৃদ্ধি। উচ্ছিন্ন—বিনাশিত।
প্রহর—দিবারাত্রির আট ভাগের এক ভাগ, তিন ঘণ্টা কাল।
উৎকণ্ঠিত চিত্তে—আশঙ্কিত হৃদয়ে। তদীয়—তাহার।
অশ্বারোহ—ঘোড়সওয়ার। পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র—পঁয়ত্রিশ হাজার।
পদাতি—যে সৈন্য পায়ে হাঁটিয়া লড়াই করে। চাটুকার—তোষামোদকারী।
যৎপরোনাস্তি—যারপরনাই। উষ্ণীষ—পাগড়ি, কিরীট।
অঙ্গীকার—প্রতিজ্ঞা। সমভিব্যাহারে—সঙ্গে। অমাত্য—মন্ত্রণাদাতা।
সন্নিধানে—নিকটে।

অনুশীলনী

১। ক্লাইব সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে কী স্থির করলেন?

২। ১৯শে জুন কী কী ঘটনা ঘটেছিল?

৩। ২২শে জুন সকালের ঘটনা সম্পর্কে কী জান?

৪। পলাশীর যুদ্ধ আরম্ভ হলে ক্লাইব, নবাব, মীরমদন ও মীরজাফর কী করেছিলেন?

৫। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের কত অশ্বারোহী ও কত পদাতিক সৈন্য উপস্থিত ছিল? পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের ভূমিকা কী?

৬। মীরমদন-এর মৃত্যু হল কিভাবে?

৭। নবাব ভৃত্যদের বিশ্বাসঘাতক বলে সন্দেহ করলেন কেন?

৮। নবাব মীরজাফরকে ডাকিয়ে তার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করলেন?

৯। মীরজাফর কী অঙ্গীকার করলেন ও কী পরামর্শ দিলেন?

১০। নবাব মুরশিদাবাদে ফিরবার পর কার নিকট থেকে কিরূপ ব্যবহার পেয়েছিলেন?

১১। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) বাঙ্গালাতে ইংরেজদিগের—আশা একেবারে—হইবেক। (খ)—গমন করিয়া রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়, — — উপস্থিত হইল। (গ) — নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধে — হইয়াছিলেন। (ঘ) তদ্দৃষ্টে নবাব — ব্যাকুল হইলেন। (ঙ) নবাব সেনাপতিদিগকে — হইতে — হইবার আজ্ঞা পাঠাইলেন।

১২। নীচের পংক্তিগুলিতে ভুল থাকলে শুদ্ধ করে লিখ :

(ক) তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের বিষয়ে সম্মতি প্রদর্শন করিলেন। (খ) মীরমদন নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। (গ) ক্লাইব-এর অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল।

১৩। অর্থ লিখ :

আন্দোলন, পত্রিকা, স্বীয়, সমবেত, অভিনিবেশপূর্বক, অবলম্বন, অভ্যুদয়, উচ্ছিন্ন, অবিশ্রান্ত, উৎকণ্ঠিত, তদীয়, চাটুকার, প্রবৃত্ত, যৎপরোনাস্তি, উষ্ণীষ, অঙ্গীকার, জগদীশ্বর, নিবৃত্ত, প্রতারণা, আরোহণ, সমভিব্যাহার, সন্নিধান, আলয়।

১৪। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) বাঙ্গালাতে… …উচ্ছিন্ন হইবেক। (খ) তিনি অকস্মাৎ……উৎসাহভঙ্গ হইল।

১৫। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :

(ক) পলাশীর যুদ্ধের পরিণাম কী হয়েছিল? বাংলার শেষ নবাব কে ছিলেন? পলাশী কোথায়?

(খ) পলাশীর যুদ্ধের লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কী জান?

দেবী রাণীর দরবার

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

['বন্দে মাতরম্'-এর উদ্গাতা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রীঃ) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪ খ্রীঃ) উপন্যাস থেকে এই আখ্যানাংশটি সংকলিত। এ-অংশটি হল 'দেবী চৌধুরাণী'র দ্বিতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবীর প্রকৃত নাম প্রফুল্ল। অল্প বয়স থেকেই তিনি স্বামী-পরিত্যক্তা। আশ্রয়হীনা এই নারী শেষ পর্যন্ত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রভূত ঐশ্বর্যের সন্ধান পান এবং ডাকাত-সর্দার ভবানী পাঠকের সংস্পর্শে আসেন। ভবানীর আদর্শ ছিল দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। মূলতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রফুল্ল শাস্ত্র এবং শক্তিসাধনায় পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন এবং 'দেবী চৌধুরাণী' নামে ডাকাত-দলের নেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিতা হন।

উদ্ধৃত আখ্যানাংশটিতে দেখা যাবে, বরেন্দ্রভূমি উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দেবী রাণী দরিদ্র জনসাধারণকে ধন দান করছেন। ভবানী পাঠকের অনুচর রঙ্গরাজ তাঁকে সাহায্য করছে। যে-সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে তখন 'এদেশে মোগল-শাসন অস্তমিত, নবাবী আমলের রাষ্ট্রীয় শান্তিও বিপর্যস্ত, কোম্পানীর শাসনও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।' ইংরেজরা এক বছরের জন্য জমিদারী ইজারা দিয়ে অর্থ গ্রহণ করতেন।]

সোমবারে প্রাতঃসূর্যপ্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর "দরবার" বা "এজ্‌লাস্"। সে এজ্‌লাসে কোন মোকদ্দমা-মামলা

হইত না। রাজকার্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত--অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে—তাহারই মাঝখানে দেবী রাণীর এজ্‌লাস্। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গান হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা মোটা রূপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদওয়া টাঙ্গান—তাতে মতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ্ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। শাড়ি পরা। শাড়িখানায় ফুলের মাঝে মাঝে এক একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মতির হার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালে প্রকৃত দেবীপ্রতিমার মত সাজিয়াছে। এ সব দেবীর রাণীগিরি। দুই পাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে। পাশে ও সম্মুখে বহু সংখ্যক চোপদার ও আশাবর্‌দার বড় জাঁকের পোশাক করিয়া, বড় বড় আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক, বর্‌কন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচশত বর্‌কন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুই পাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত—লাল পাগ্‌ড়ি, লাল আঙ্গরাখা, লাল ধুতি মালকোঁচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল-সড়কি। চারিদিকে লাল নিশান পোঁতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার "দেবী রাণী কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তার পর দশজন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতিগান করিল। তার পর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক একজন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসন সমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেন না, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেই জন্য কেহ কখনও তাঁহার সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।

কিছুদিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়ৎবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া ঘরে অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে, টাকা কোথা? ইহার কারণ, ভয় আছে, টাকার

কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা, খরচপত্র করিতে লাগিল—সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরাণী এবার ভারী রকম লুঠিতেছে।

[দেবী চৌধুরাণী]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

প্রভাসিত—দীপ্ত, আলোকিত। কানন—অরণ্য, বাগান (এখানে অরণ্য অর্থে)।
দরবার—সভা, রাজসভা, আদালত। এজ্‌লাস্—আদালত, বিচারালয়।
বিঘা—ভূমির পরিমাণবিশেষ। ২০ কাঠা বা ৬,৪০০ বর্গহাত বা $\frac{২}{৫}$ একর।
সামিয়ানা—বস্ত্রনির্মিত অস্থায়ী ছাদ।
কিংখাপ—ফুলকাটা জরিদার রেশমী কাপড়। চাঁদওয়া—চন্দ্রাতপ, সামিয়ানা।
মতি—মুক্তা। চামর—চমরী গোরুর পুচ্ছনির্মিত পাখা।
চোপদার—রাজদণ্ডধারী সুসজ্জিত ভৃত্য। আশাবর্দার—দণ্ডধারী।
আশা—লাঠি। বর্কন্দাজ—বন্দুকধারী সিপাই বা দেহরক্ষী।
আঙ্গরাখা—অঙ্গত্রাণ, জামা। নাগরা—চর্মনির্মিত পাদুকা।
সাষ্টাঙ্গে—অষ্টাঙ্গের সহিত। (জানু চরণ হস্ত বক্ষ মস্তক চক্ষু দৃষ্টি ও বাক্য—এই অষ্ট অঙ্গের সহিত)। মুনকির—অবিশ্বাসী।
ইজারাদার—খাজনার ব্যাপারে জমির ঠিকাদার। পাইক—পেয়াদা।

অনুশীলনী

১। 'দেবী রাণীর দরবার' কোথায়? সেখানে কী হ'ত? 'দরবার'টির বর্ণনা দাও।

২। দেবী রাণীর বেশভূষার বর্ণনা দাও। তাঁর অনুচর ও অনুচরীদের সম্পর্কে কী জানো? 'দেবীর রাণীগিরি' বলতে কী বোঝ?

৩। 'দেবী সিংহাসনে আসীন' হবার পর কী কী ঘটল?

৪। "দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।" কোন্ প্রসঙ্গে এবং কী কারণে এই মন্তব্য, বুঝিয়ে বলো।

৫। "সুতরাং সকল লোকেরই এরূপ বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরাণী এবার ভারী রকম লুঠিতেছে।" লোকের এরূপ বিশ্বাসের কারণ কী, মূল প্রসঙ্গ অনুসরণ করে বুঝিয়ে দাও।

৬। 'দেবী রাণীর দরবার' রচনাটি পাঠ করে 'দেবী' সম্পর্কে তোমার কী ধারণা জন্মে? কেন জন্মে?—গুছিয়ে বলো।

৭। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) রাজকার্যের মধ্যে···অকাতরে দান। (খ) দেবী আজ···রাণীগিরি।

৮। অর্থ বলো :

প্রাতঃসূর্যপ্রভাসিত, নিবিড় কাননাভ্যন্তর, সামিয়ানা, কিংখাপ, চাঁদওয়া, বেদী, গৌরবর্ণ, চোপদার, আশাবর্দার, বর্কন্দাজ, আঙ্গরাখা, স্তুতিগান, জমায়ৎবস্ত।

৯। সমাস বলো ও ব্যাসবাক্য লিখ :

প্রাতঃসূর্যপ্রভাসিত, কাননাভ্যন্তর, রাজকার্য, অকাতর, ভূমিখণ্ড, চন্দনকাষ্ঠ, সিংহাসন, গৌরবর্ণ, দেবীপ্রতিমা, সুসজ্জিতা, স্বর্ণদণ্ড, জয়ধ্বনি, সাষ্টাঙ্গ, বয়োজ্যেষ্ঠ।

১০। কোন্‌টি বিশেষ্য, কোন্‌টি বিশেষণ বলো :

নিবিড়, কানন, মোকদ্দমা, পরিষ্কার, বেদী, চন্দনকাষ্ঠ, বেশভূষা, স্তুতিগান, উজ্জ্বল, দরিদ্রগণ।

১১। সন্ধি-বিচ্ছেদ কর :

কাননাভ্যন্তর, বয়োজ্যেষ্ঠ।

১২। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :

(ক) 'দেবী রাণী'র প্রকৃত নাম কী? তাঁর জীবনের এমন কোনো ঘটনা বলো, যা তিনি রাণী হবার পূর্বে ঘটেছিল।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রকে 'সাহিত্য-সম্রাট' বলা হয় কেন?

(গ) 'বন্দে মাতরম্' গানটির প্রথম চার পংক্তি মুখস্থ বলো। এ-গানটি প্রথম কোন্ গ্রন্থে স্থান পায়?
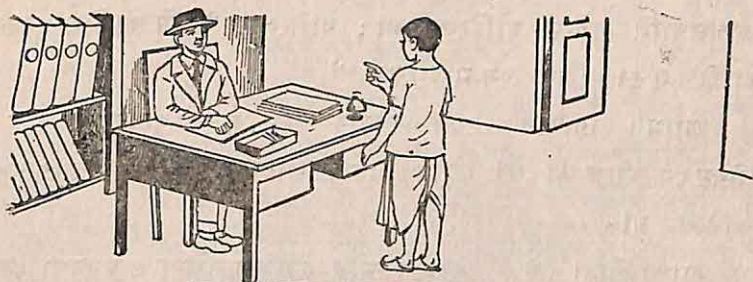
চটি পায়ে উড্রো সাহেবের ঘরে

শিবনাথ শাস্ত্রী

[শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রীঃ) বাংলার এক বরেণ্য পুরুষ। এদেশে শিক্ষাবিস্তারে, দেশসেবায় এবং সৎ-সাহিত্য রচনায় তাঁর দান অসামান্য। এই রচনাটি শিবনাথ শাস্ত্রীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আত্মচরিত' (১৯১৮) থেকে গৃহীত। বোধ হয়, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুরে চৌধুরী বাড়িতে যান। এই বাড়িটি ছিল কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল মহেশচন্দ্র চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত। ওখানে থেকে কলেজে পড়বার সময় তাঁর পিতা পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্যের নির্দেশে তিনি উড্রো সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন।]

সাল তারিখ মনে নাই, ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয়ে বাসের কালে, একবার আমার পিতাঠাকুর মহাশয় একখানি সরকারি কাগজ আমার নিকট পাঠাইয়া আদেশ করিলেন, তাহা আমাকে স্বয়ং গিয়া স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেবের হাতে দিতে হইবে। তদনুসারে একদিন কলেজে যাইবার পথে আমি উড্রো সাহেবের আপিসে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার আপিস গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সাহেব তখন পাশের ঘরে আহারে বসিয়াছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই উপস্থিত হইলেন। আমি অভিবাদন করিয়া তাঁহার হস্তে কাগজখানি দিলাম। তিনি

কাগজখানি লইতে চাহিলেন না ; বলিলেন, "তুমি আপিস ঘরের বাহিরে জুতা খুলিয়া এস নাই কেন ?"

আমি। এ-ঘরে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিতে হয় এ-নিয়ম যে আছে তা তো জানিতাম না, তাহা হইলে এ-ঘরে প্রবেশ করিতাম না।

ব্যাপারখানা এই। তখন আমার এমনি দারিদ্র্য ও দুরবস্থা যে, আমাকে চটিজুতাই সর্বদা পরিতে হইত, বুটজুতা পরা ভাগ্যে ঘটিত না। সুতরাং সেদিন চটিজুতা পায়ে দিয়াই কলেজে যাইবার পথে সাহেবের আপিসে গিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়াই সাহেব চটিয়াছিলেন।

সাহেব। তুমি জুতা পরিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কিরূপে আপনার অপমান করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে, আপনার কেরাণীবাবুর পায়ে জুতা দেখিতেছি। আপনারা যদি খোলেন তবে আমি খুলিতে পারি।

সাহেব। ও যে বুটজুতা।

আমি। বুটজুতা পায়ে দিয়ে এলে আপনার মান থাকিত, আর চটিজুতা পায়ে দিয়ে আসাতে আপনার মান গেল, এ নূতন কথা, ইহা আমি কিরূপে বুঝিব ?

সাহেব। হাঁ, আমার আপিসের এ-নিয়ম আছে, তাহা তুমি কি জানো না ?

আমি। না সাহেব, আমার জন্মে এমন নিয়ম শুনি নাই।

সাহেব। তুমি জুতা খুলিবে কি না, বল।

আমি। না সাহেব, খুলব না।

সাহেব। তবে তোমার চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনার ডেস্কের উপর রইল। ও আপনাদেরই কাগজ, নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম। এই বলিয়া ডেস্কের উপর কাগজ রাখিয়া আমি যাইতে উদ্যত। সাহেব বলিলেন, "শোনো শোনো, দাঁড়াও।" আমি দাঁড়াইলাম।

সাহেব। রাজা রাধাকান্ত দেব অত্যন্ত পীড়িত, তুমি কি শুনেছ?

আমি। হাঁ সাহেব, শুনেছি।

সাহেব। আমার গাড়ি জোতা হচ্ছে, আমি এখনই তাঁকে দেখতে যাব। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

আমি। না সাহেব, আমাকে কলেজে যেতে হবে, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

সাহেব। আচ্ছা, যদি তুমি আমার সঙ্গে যাও, তাঁর ঘরে প্রবেশ করবার সময় জুতা খুলবে কি না?

আমি সেখানে জুতা খুলিবার কারণ বলিতে যাইতেছি, সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "'হাঁ' কি 'না' বল, আমি আর কিছু শুনতে চাই না।"

আমি। হাঁ সাহেব, সেখানে খুলব।

সাহেব। তবে আমার এখানে খুলবে না কেন?

আমি। আপনি কারণ শুনবেন না, তবে আমি কি করব? কারণটা শুনিলে বলিতাম যে, বাঙালী ভদ্রলোকের বৈঠকখানাতে জাজিম পাতা থাকে, সকলেই জুতা খুলিয়া প্রবেশ করে, সুতরাং আমাকেও সেইভাবে প্রবেশ করিতে হইত। কিন্তু সাহেব যখন আমার কথাতে কান দিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া মৌনাবলম্বন করিলাম, এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহির হইলাম।

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

অভিবাদন—নমস্কার জ্ঞাপন। ডেস্ক—লেখাপড়ার কাজে ব্যবহৃত টেবিল।
উদ্যত—উন্মুখ। গাড়ি জোতা—গাড়িতে ঘোড়া-গোরু প্রভৃতি যোজিত করা।
জাজিম—ফরাস বিছানা গালিচা প্রভৃতির উপর বিছানোর চাদরবিশেষ।
মৌনাবলম্বন—কথা বলা বন্ধ করা।

অনুশীলনী

১। "তদনুসারে একদিন কলেজে যাইবার পথে আমি উড্রো সাহেবের আপিসে উপস্থিত হইলাম।" তদনুসারে বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'আমি'টি কে? উড্রো সাহেব কে ছিলেন? এই কাহিনী পড়ে সাহেবটির চরিত্র সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়?

২। "তিনি কাগজখানি লইতে চাহিলেন না"—'তিনি' কে? কাগজ-গ্রহণে তাঁর আপত্তির কারণ কী? কাগজ-বাহক কীভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলেন? সাক্ষাতের পর কী কী ঘটল?

৩। 'চটিপায়ে উড্রো সাহেবের ঘরে' কে গিয়েছিলেন? তাঁর সঙ্গে সাহেবের কথোপকথন বর্ণনা কর।

৪। 'চটিপায়ে উড্রো সাহেবের ঘরে' নামক কাহিনীতে 'আমি' চরিত্রটি কে? কাহিনীটি পাঠ করে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়, নিজের ভাষায় বলো।

৫। "বুটজুতা পরা ভাগ্যে ঘটিত না।"—এই উক্তিটি কার? নিজের ভাগ্য সম্পর্কে কেন তাঁর এই মন্তব্য? বুটজুতা না পরবার ফলে তাঁর কী বিপদ হয়েছিল, সংক্ষেপে বলো।

৬। "তবে তোমার চিঠি নেব না।"—কে কাকে কখন্ এই কথা বলেছিলেন? এই কথা বলার পর কী কী ঘটেছিল, সংক্ষেপে প্রকাশ কর।

৭। "হাঁ সাহেব, সেখানে খুলব।"—'সেখানে' বলতে কোন্খানে? 'খুলব' বলতে কী বোঝান হয়েছে? সাহেবের সঙ্গে এ-বাক্যের বক্তার চরিত্র-পার্থক্য কোন্খানে, বুঝিয়ে দাও।

৮। "তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ঘরের বাহির হইলাম।" কোন্ অবস্থায়, কী কারণে, কে অভিবাদন করলেন?

৯। ব্যাখ্যা কর:

(ক) বুটজুতা...ঘটিত না। (খ) আপনারা যদি...খুলিতে পারি।

১০। অর্থ বলো:

কিয়ৎক্ষণ, দুরবস্থা, উদ্যত, জাজিম, মৌনাবলম্বন, অভিবাদন।

১১। বাচ্য-পরিবর্তন কর:

(ক) সাহেব। তুমি জুতা...খুলিয়া এস। (খ) আমি। না সাহেব... শুনি নাই।

১২। "**আমি** অভিবাদন করিয়া **তাঁহার হস্তে** কাগজখানি দিলাম।"—স্থূলাকৃতি শব্দগুলির কোন্‌টির কী কারক ও কী বিভক্তি, বলো।

১৩। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) শিবনাথ শাস্ত্রী কে ছিলেন? তাঁর সমসাময়িক অন্ততঃ তিনজন স্মরণীয় বাঙালীর নাম বলো।

(খ) 'চটিপায়ে উড্রো সাহেবের ঘরে' রচনাটি কোন্ পর্যায়ের? নাটক, স্মৃতিকথা, না গল্প? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন কর।

(গ) শঠতা, তেজস্বিতা, সাহসিকতা, ভীরুতা—এদের মধ্যে কোন্ শব্দটি ব্যবহার করলে শিবনাথ শাস্ত্রীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়? তোমার নির্বাচনের সপক্ষে উপযুক্ত কারণ দেখাও।

গজদন্ত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তন করে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রীঃ) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পদ্রব্য সম্বন্ধেও তাঁর কয়েকটি মূল্যবান রচনা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদ্ধৃত রচনাটিতে তিনি ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের একটি লুপ্তপ্রায় উপকরণ গজদন্ত নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।]

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে গজদন্তের কারুকার্য প্রচলিত আছে। বৃহৎসংহিতার মতে, খাট পালঙ্ক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার উপযোগী ইহার তুল্য আর অপর বস্তু নাই। এই পুস্তকের মতে খাটের পায়াগুলি গজদন্তে নির্মাণ হওয়া আবশ্যক। অপরাপর অংশ কাষ্ঠ দ্বারা নির্মাণ করিয়া তাহার উপর হস্তিদন্ত বসাইয়া দিলে চলিতে পারে। ভারতবর্ষে যেমন অন্যান্য কারুকার্যের অবনতি হইয়াছে, সেইরূপ এ কার্যেরও অবনতি হইয়াছে, আর দিন দিন অধিকতর অবনতি হইতেছে। চুড়ি করিবার নিমিত্তই এক্ষণে হস্তিদন্ত এদেশে বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের এদিকে পূর্বে যেরূপ শাঁখা না হইলে চলিত না ভারতবর্ষের নানাস্থানে এখনও সেইরূপ গজদন্তের চুড়ি না হইলে চলে না। এ অঞ্চলে যেরূপ বিবাহের সময় কন্যাকে

হীরা-মণি-মাণিক্যের সহস্র গহনা দিলেও সঙ্গে দুইগাছা কড় দিতেই হইবে; রাজপুতানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সেইরূপ অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত কন্যাকে গজদন্তের চুড়ি দিতেই হইবে।

চুড়ির পর এদেশে গজদন্ত চিরুণি করিবার নিমিত্তই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিরুণির প্রধান আড্ডা দিল্লী ও অমৃতসর। চিরুণি করিয়া যাহা কিছু সামান্য গজদন্ত বাদ পড়ে, তাহা আবার অন্য লোকে ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। সেই গজদন্তের পাত তাহারা বাক্স প্রভৃতি কাঠের দ্রব্যে বসাইয়া দেয়।...

কেবল গজদন্ত হইতে যে সমুদয় দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা মুরশিদাবাদেই অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে। এরূপ সুন্দর শিল্প-কৌশল আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। মুরশিদাবাদের কারিগরেরা দুর্গা প্রতিমা, কালী প্রতিমা, হস্তীশকট, ময়ূর-পঙ্খি নৌকা প্রভৃতি নানাদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মুরশিদাবাদে এ ব্যবসায়ের কিন্তু ক্রমেই অবনতি হইয়া আসিতেছে।...

গজদন্তকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিরিয়া চামর হয়, আবার তাহাকে বুনিয়া মাদুর শীতলপাটী করিতে পারা যায়। পূর্বকালে শ্রীহট্টে এইরূপ পাটী অনেক হইত। এক্ষণে ব্যবসা লোপ পাইয়াছে।...

সেকালের রাজারা বাছিয়া বাছিয়া নানারূপ কারিগর চাকর রাখিতেন। তাহারা বসিয়া বসিয়া ধীরে-সুস্থ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিত। সরকারি বেতন আছে, অন্নের চিন্তা নাই। তাড়াতাড়ি কর্ম শেষ করিয়া বেচিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং পূর্বে যেরূপ সূক্ষ্ম কাজ হইত, এক্ষণে আর সেরূপ সূক্ষ্ম কাজ হয় না। আবার কর্মটি সমাধা হইলে যথাবিধি পুরস্কারও মিলিত।...

হস্তিদন্তের বিষয়ে অধিক আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কি

কি বস্তু ইহা দ্বারা হয়, উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা হইতে একপ্রকার বুঝা যাইবে। স্থূল কথা এই, এ কার্যের উন্নতি নাই, উন্নতি হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল এ কার্য কেন? আমার মত এই যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন কোনও সূক্ষ্ম কার্যেরই আর বিশেষরূপে উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।...পূর্বের মত সূক্ষ্ম-কার্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া অধিক অর্থ লাভের আর প্রত্যাশা নাই। লোকে এখন সকল দ্রব্যই সুলভমূল্যে কিনিতে বাসনা করেন। ভাল দ্রব্য কিন্তু সুলভ হইতে পারে না। ভাল দ্রব্যের তাই ক্রেতা নাই। আহারীয় দ্রব্যাদি যেরূপ মহার্ঘ হইয়াছে, তাহাতে কারিগরেরা পূর্বের দরেও এখন ভাল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না। সেইরূপ দ্রব্য এখন কিন্তু লোকে অর্ধেক দামে কিনিতে চান, এইরূপ অবস্থায় যে ফল ফলা সম্ভব, তাহাই ফলিতেছে। অন্নাভাবে কারিগরগণ স্ব স্ব ব্যবসা পরিত্যাগ করিতেছে।

[ত্রৈলোক্য রচনাসমগ্র (গ্রন্থমেলা সংস্করণ) ২য় খণ্ড]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

বৃহৎসংহিতা—বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ বরাহমিহির লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সূর্য-চন্দ্রের গতি ও প্রভাব, আবহবিদ্যা এবং স্থাপত্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত। বরাহমিহির কারও মতে ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, আবার কারও মতে ৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। অনেকের আবার ধারণা, বরাহ পিতার এবং মিহির তাঁর পুত্রের নাম।

কড়—বিবাহে কন্যার ধারণীয় গালার বা লোহার বালা।

শকট—গাড়ি। ময়ূর-পঙ্খি—ময়ূর পক্ষীর আকৃতি নৌকাবিশেষ।

চামর—চমরী গোরুর পুচ্ছনির্মিত পাখা। (এখানে চামরের মতো দেখতে শৌখিন দ্রব্য অর্থে)।

শীতলপাটী—শৈত্যগুণযুক্ত মসৃণ মাদুরবিশেষ। মহার্ঘ—মহামূল্যবান।

অনুশীলনী

১। বৃহৎসংহিতা থেকে গজদন্ত সম্পর্কে কী জানা যায়? একালের ভারতবর্ষে গজদন্ত-শিল্প কোন্ পথে? কোন্ শিল্পে গজদন্তের ব্যবহার বেশী? রাজপুতানা, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে গজদন্ত কীভাবে কাজে লাগে?

২। চিরুণির সঙ্গে গজদন্ত-শিল্পের যোগ কোথায়? গজদন্তের কারুকার্যে কোন্ অঞ্চলের শিল্পীরা শ্রেষ্ঠ, আলোচনা কর।

৩। গজদন্তের দ্বারা কী কী বস্তু তৈরি হয়, বুঝিয়ে বলো।

৪। সেকালের সঙ্গে একালের গজদন্ত-শিল্পে পার্থক্য কোথায়? গজদন্ত-শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথের অভিমত কী?

৫। গজদন্ত নামক রচনাটি পাঠ করে ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা হয় তা গুছিয়ে বলো।

৬। ব্যাখ্যা লিখ:

ভারতবর্ষের প্রাচীন···সম্ভাবনা নাই।

৭। অর্থ বলো:

কড়, হস্তীশকট, মহার্ঘ।

৮। ব্যাসবাক্য লিখ ও সমাসের নাম বলো:

গজদন্ত, হস্তীশকট, ময়ূর-পঙ্খি, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম, অন্নাভাব।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) গজদন্ত-শিল্প ছাড়া অন্ততঃ দু'টি দেশীয় শিল্পের নাম বলো।

(খ) বর্তমান ভারতবর্ষে কী ধরনের শিল্পের বেশি চাহিদা হবে বলে তোমার ধারণা?

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস

জগদীশচন্দ্র বসু

[পদার্থবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানে মৌলিক আবিষ্কারের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭ খ্রীঃ) বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। সাহিত্য-সৃষ্টিতেও তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁর বিভিন্ন বাংলা রচনা 'অব্যক্ত' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ) নামক গ্রন্থে সংকলিত। জগদীশচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্য, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের কথা সেখানে অতি সরল ও সুন্দরভাবে ব্যক্ত। উদ্ধৃত রচনাটিতেও এ-বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই। এ রচনাটি হল বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ। এর রচনাকাল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ।]

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ্‌জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে ? উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই-চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাতে দৃশ্যভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর, লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রের অগ্রণী

পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন। আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোন সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদ্-জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ, এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে এইসব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় কোন প্রকারে তাহা ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানা-রূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে। যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত-পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা 'নাড়া'র উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত

অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজ-কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাততঃ অসম্ভব কার্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে লইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার করা যে একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক-লিপি সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত—অশিক্ষিত কিম্বা অর্ধ-শিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য।

সে যাহা হউক, মানসসিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমতঃ, গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান; দ্বিতীয়তঃ, গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা-নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি।...

বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে। বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্তে মুহূর্তে নির্ণীত হইবে। তাহার স্বতঃস্পন্দন লিখিত হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই

কলের আশ্চর্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময়গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে, এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদের কারিকর দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এই দেশীয়।

এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

অগ্রগণ্য—সবার আগে উল্লেখযোগ্য ; শ্রেষ্ঠ ; প্রধান।
সূক্ষ্মদর্শী—অতিশয় বুদ্ধিমান। (এখানে সূক্ষ্মভাবে দেখা যায় এমন যন্ত্র অর্থে)।
মনগড়া—কাল্পনিক, অবাস্তব। আভ্যন্তরিক—ভিতরস্থ। মূক—বোবা।
পরাভূত—পরাজিত। মানসসিদ্ধি—আশাপূরণ। প্রতিবন্ধক—বাধা ; অন্তরায়।

অনুশীলনী

১। "ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত।" কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য ?—জগদীশচন্দ্রের পূর্বসূরী বিজ্ঞানীদের ধারণা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

২। উদ্ভিদ্-জগৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনগড়া মতের কারণ কী? প্রকৃত তত্ত্ব জানতে গেলে আমাদের কী করণীয়? বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আমরা কীভাবে জানতে পারি?

৩। 'নাড়া'র উত্তরে 'সাড়া'—কোন্ প্রসঙ্গে কোথায় এই মন্তব্য করা হয়েছে? বৃক্ষজীবনের সঙ্গে এর যোগ কোথায়?

৪। "নূতন লিপি প্রচার করা যে একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।" কোন্ প্রসঙ্গে কী ধরনের লিপির কথা এখানে বলা হয়েছে?

৫। "এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।" এখানে কী ধরনের পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে? কীভাবে বৃক্ষজীবনের ইতিহাস জানা সম্ভব?

৬। বৃক্ষজীবনের ইতিহাস জানবার পথে প্রধান দু'টি প্রতিবন্ধক কী? কীভাবে এদের অতিক্রম করা যায়?

৭। 'বৃক্ষজীবনের ইতিহাস' পাঠ করে উদ্ভিদ্-জগৎ সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা জন্মেছে, বুঝিয়ে বলো। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মৌলিকত্ব কোথায়?

৮। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) প্রধানত…লইতে হইয়াছে। (খ) কেবলমাত্র…করিতে হইবে। (গ) এক-লিপি সভার…নাই। (ঘ) সৌভাগ্যের বিষয়·· দুর্বোধ্য। (ঙ) শিশুকে দিয়া…কঠিন সমস্যা।

৯। অর্থ বলো:

প্রসারিত, উদ্ভিদ্তত্ত্ব, দৃশ্যভাবে, বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য, অগ্রণী, সূক্ষ্মদর্শী, মনগড়া, আভ্যন্তরিক, মূক, পরাভূত, প্ররোচনা, মানসসিদ্ধি, আজ্ঞাপালন, স্বতঃস্পন্দন।

১০। সমাস বলো ও ব্যাসবাক্য লিখ:

উদ্ভিদ্ জগৎ, সূক্ষ্মদর্শী, মনগড়া, স্বহস্ত-লিখিত, হাত-পা, কাগজে-কল[illegible] মানসসিদ্ধি।

১১। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছাড়া অন্ততঃ তিনজন বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম বলো।

(খ) তোমার দেখা যে-কোনো দশটি বৃক্ষের নাম বলো। কী ধরনের বৃক্ষকে তোমার বেশি পছন্দ, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(গ) বৃক্ষজীবনের ইতিহাসের সঙ্গে গতানুগতিক রাজারাজড়াদের ইতিহাসের পার্থক্য কোথায়?

[ভগবান্ বুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) তাঁর 'অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি' করতেন। এ রচনাটি হল ১৩৪২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রণাম। মূল রচনা 'বুদ্ধদেব'-এর অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত।]

ভগবান্ বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সঙ্কল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?

জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেরেছি ঠেকাতে? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভাণ্ডার; তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি? কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা

বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যয়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না ; কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভাণ্ডার বিষয়ীর ভাণ্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সঙ্কুচিত করে এনেছে ; মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে ; কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে ঃ তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে মানবের গুরু বলেছেন ঃ ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে ; রাষ্ট্রগত

বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না ; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে—কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্কোধেন জিনে কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্‌ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল ঃ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি এই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক ; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে ; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়।

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী

ম্লেচ্ছ—অসভ্য, পাপিষ্ঠ, কদাচারী। অবরুদ্ধ—আবদ্ধ, বন্দী।
সাম্প্রদায়িক—সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন। সঙ্কুচিত—সঙ্কীর্ণ।
প্রচ্ছন্ন—আবৃত, গুপ্ত। রাষ্ট্রনীতি—রাজনীতি।
মহাযুদ্ধ—এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯ খ্রীঃ) অর্থে।
সমাজনীতি—সমাজের গঠন, সংস্কার ও পরিচালন-বিষয়ক বিধান।
ভ্রূকুটি—ভ্রূভঙ্গী ; ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূর বক্রতা।
পাশবতা—পশুসুলভ অমানুষিক কাজ। অক্কোধেন—অক্রোধের দ্বারা।
নঞর্থক—নেতিবাচক। সদর্থক—অস্তিত্ববাচক।

অনুশীলনী

১। কোন্ সম্পদ ত্যাগ করে কী উদ্দেশ্যে ভগবান্ বুদ্ধ তপস্যায় বসেছিলেন ? এই তপস্যার স্বরূপ কী ছিল ? আজকের ভারতবর্ষ বুদ্ধের তপস্যাকে কতটুকু গ্রহণ করছে ?

২। এ-যুগের ভারতবাসী বুদ্ধের তপস্যাকে গ্রহণ না করে কীভাবে তাদের ক্ষতি ডেকে আনল? বর্তমান ভারতবর্ষের দুর্দশার পরিচয় দিয়ে তার অধঃপতনের কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩। আজকের পৃথিবীতে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করা প্রয়োজন কী কারণে?

৪। "মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল।"—কোন্ প্রসঙ্গে কে কোথায় এই মন্তব্য করেছেন?—পঠিত রচনাংশ অনুসরণ করে বিস্তৃত আলোচনা কর।

৫। ভগবান্ বুদ্ধের বাণী কী? 'বাহুবলের জয়' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কী অভিমত? মানুষের প্রকৃত শক্তি কোথায়? প্রকৃত শান্তি কীভাবে আসতে পারে?

৬। প্রতিহিংসাকে জয়ী করার প্রবৃত্তির পরিণতি কী? এ-যুগের দুঃখ ও অপমান থেকে মুক্তি কীভাবে মিলতে পারে?

৭। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"—এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বুদ্ধ-বাণীর বিশিষ্টতা বুঝিয়ে দাও। ভগবান্ বুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে দেখেছেন?

৮। ব্যাখ্যা কর :

(ক) আজ দেবতার…ঠেকিয়ে রেখে। (খ) দানের দ্বারা…করে রাখলুম। (গ) পুণ্যের…ধরল। (ঘ) মানুষকে অশ্রদ্ধা…হল। (ঙ) জেলখানার… যাবে না। (চ) তাঁরই শরণ…মৈত্রীসাধনায়।

৯। অর্থ বলো :

রাজসম্পদ, দুঃখমোচন, অধিকারভেদ, ম্লেচ্ছ, নির্বিচার, বিলীন, অবরুদ্ধ, অশ্রদ্ধাভাজন, মনুষ্যত্ব, সঙ্কুচিত, প্রতিহিংসা, ভ্রূকুটিবিক্ষেপ, উত্তরোত্তর, দুঃসহ, পাশবতা, নিরস্ত, নঞর্থক, অপরিমেয়, মৈত্রীসাধনা।

১০। টীকা লিখ :

সাম্প্রদায়িক, সিন্দুক, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, 'অক্রোধেন জিনে ক্রোধং'।

১১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

নির্বিচার, নিষ্ফল, উত্তরোত্তর, দুরাশা।

১২। সমাস বলো ও ব্যাসবাক্য লিখ :

রাজসম্পদ, দুঃখমোচন, অশ্রদ্ধাভাজন, সত্যভ্রষ্ট, মহামানব, বাহুবল, রাষ্ট্র-নীতি, সৈন্যনিবাস, ভ্রূকুটিবিক্ষেপ, রাগদ্বেষ, মৈত্রীসাধনা।

১৩। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :

(ক) তোমার মতে, ভগবান্ বুদ্ধের বাণী ও আদর্শ কতদূর গ্রহণযোগ্য ? বুদ্ধের সমগোত্রীয় অন্ততঃ দু'জন জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষের নাম বলো।

(খ) কোন্ মহাপুরুষের জীবনকে তুমি সবচেয়ে আদর্শস্থানীয় বলে মনে কর ?—যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(গ) সংকলিত রচনাগুলো ছাড়া রবীন্দ্রনাথের লেখা অন্ততঃ তিনটি গদ্য রচনার নাম বলো।

[ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) বরাবরই অদম্য কৌতূহল ছিল। তিনি নিজেও এ-নিয়ে অনেক লিখেছেন। এ-রচনাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ইতিহাস' নামক গ্রন্থের 'ঝান্সীর রানী' নামক অধ্যায় থেকে সংকলিত। এ-রচনার পটভূমি সিপাহী বিদ্রোহ ;—অর্থাৎ ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সশস্ত্র বিপ্লব। ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন এ-বিপ্লবের অন্যতম কাণ্ডারী। এখানে তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও অতুলনীয় সাহসিকতার কাহিনী বর্ণিত।]

আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠক-দিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ড্যালহূসী ঝান্সী রাজ্য ইংরাজ-শাসনভুক্ত করিলেন এবং ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকা-স্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রানীর সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল।

কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত স্বামীর যাহা কিছু ঋণ ছিল তাহা রানীর জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রানী ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজরা তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল, কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কোম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাঈ অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ, মনও তেমনি দৃঢ় ছিল।

রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাজ্যপালনের জটিল ব্যাপারসকল অতি সুন্দররূপে বুঝিতেন। ইংরাজ কর্মচারিগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব-অনুসারে এই হৃতরাজ্য রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, তাহার এক বর্ণও সত্য নহে।

ঝান্সী নগরী অতিশয় পরিপাটি পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে সেই-সকল প্রাচীরের চতুর্দিক সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপর দৃঢ়দুর্গবদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝান্সী নগরীর রক্ষাভার ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে

সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝান্সীর শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝান্সী রাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় নীরব ঝান্সী নগরীর মর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্গিরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাংলা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, একদল সিপাহী ঐ দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোনোমতে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইউরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরীদুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহিগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপ্তেন ডান্‌লপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী সৈন্যেরা দুর্গের নিম্ন অংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধনকার্যে রাজ্ঞীর কোনো হস্ত ছিল না, এমন কি এ সময়ে রাজ্ঞীর কোনো অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারীদিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল, কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে একজন ঐ রাজ্যের প্রার্থী

কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্যকর্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল।

[ইতিহাস]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

বীরাঙ্গনা—বীর নারী। ঝান্সী—বুন্দেলখণ্ডের ঝাঁসি নামক ক্ষুদ্র রাজ্য। লর্ড ড্যাল্‌হৃসী—লর্ড ড্যাল্‌হৃসী বা ড্যাল্‌হৌসী (১৮১২-৬০ খ্রীঃ) ইংরেজ-শাসিত ভারতের এক বিখ্যাত গভর্ণর-জেনারেল। তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে ভারতে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের সীমানা অনেকদূর অবধি বিস্তৃত হয়। অনেকের মতে, তাঁর দেশীয় রাজ্য অধিকারের নীতি সিপাহী বিদ্রোহের জন্য অনেকখানি দায়ী। উপজীবিকা—বৃত্তি, পেশা। কুঞ্জ—উপবন। উদ্গিরিত—নিঃসরিত। ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট—সৈন্যদের ছাউনি। ডাকবাংলা—সরকারী কর্মচারী ও ভ্রমণকারীদের ব্যবহার্য সরকারী পান্থশালা।

অনুশীলনী

১। ঝান্সীর রানীর প্রকৃত নাম কী? ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ও লর্ড ড্যাল্‌হৃসীর সঙ্গে কীভাবে তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়?

২। 'সিপাহী বিদ্রোহের বীরাঙ্গনা' কে? তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতি কেমন ছিল? কী কারণে, কাদের বিরুদ্ধে এবং কীভাবে তিনি 'অপমানের প্রতিশোধ' নেবার উদ্যোগ করলেন?

৩। ঝান্সী নগরী ও ঝান্সী-রাজপ্রাসাদের বর্ণনা দাও। কাপ্তেন ডান্‌লপের সঙ্গে ঝান্সী নগরীর কোন্‌দিক দিয়ে কতটুকু যোগ ছিল? বিদ্রোহের সময় তাঁর এবং অন্যান্য ইংরেজ সৈন্যদের কী পরিণতি হল?

৪। ঝান্সী রাজ্যে কীভাবে বিপ্লব ধূমায়িত হচ্ছিল? কীভাবে তা ছড়িয়ে পড়ল? ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী সৈন্যদের সংঘাত বর্ণনা কর। এই সংঘাতে

ঝান্সীর রানীর কী ভূমিকা ছিল? কীভাবে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেন?

৫। 'সিপাহী বিদ্রোহের বীরাঙ্গনা' রচনাটি পড়ে ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা জন্মে? বিদ্রোহী সৈন্যদের কর্মকীর্তির বর্ণনা দাও।

৬। "এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন" :—এই উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও। রাজ্ঞীর প্রতিহিংসা কীভাবে কতদূর সিদ্ধ হয়েছিল, বলো।

৭। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) এইরূপে……করিতে লাগিলেন। (খ) সহসা একদিন…… উদ্গিরিত হইল।

৮। অর্থ বলো:

বীরাঙ্গনা, লিপিবদ্ধ, উপজীবিকা, সুকুমার, মর্মস্থল, অগ্নিস্রাব, উদ্গিরিত, প্রত্যর্পণ, সেনানায়ক।

৯। "আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি।"—এই বাক্যটির মধ্য থেকে সন্ধিবদ্ধ পদগুলোকে খুঁজে বের কর এবং তাদের সন্ধি-বিচ্ছেদ কর।

১০। 'লক্ষ্মীবাঈ অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন।'—এই বাক্যটিতে কোন্‌টি কী পদ বলো।

১১। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) সিপাহী বিদ্রোহ কোন্ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ভারতের আরও অন্ততঃ একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের নাম বলো।

(খ) ঝান্সী জায়গাটি কোথায়? ঝান্সী ছাড়া ভারতের আর কোন্ কোন্ জায়গায় সিপাহী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে? এই বিদ্রোহের অন্ততঃ তিনজন প্রধানের নাম বলো।

(গ) 'সিপাহী বিদ্রোহের বীরাঙ্গনা' কী ধরনের রচনা? স্বাধীন ভারতে এ ধরনের রচনা-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কোন্‌খানে, বুঝিয়ে দাও।

রক্তের নেশা
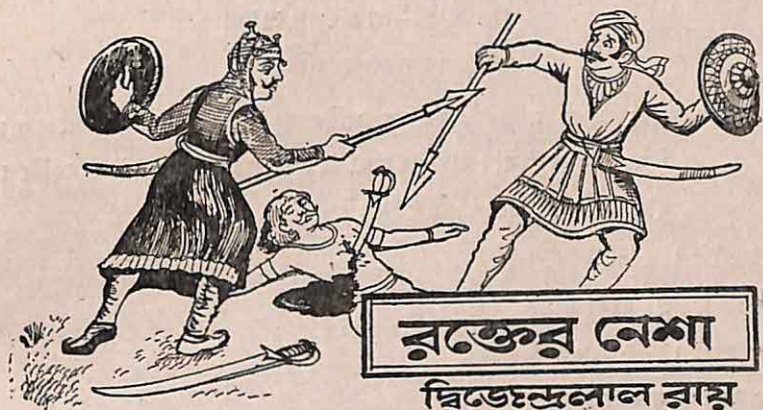
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রীঃ) বাংলা সাহিত্য-জগতে এক বরণীয় প্রতিভা। নতুন আঙ্গিকে কবিতা ও গান রচনার জন্য এবং স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় কয়েকটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য তিনি প্রভূত খ্যাতি ও জনসমাদর লাভ করেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'রাণা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫ খ্রীঃ), 'নূরজাহান' (১৯০৮ খ্রীঃ), 'সাজাহান' (১৯০৯ খ্রীঃ) ও 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১ খ্রীঃ)। উদ্ধৃত নাট্যাংশটি দ্বিজেন্দ্রলাল-এর 'রাণা প্রতাপসিংহ' নামক নাটকের প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্যের একটি অংশ। আকবর 'অন্যায় সমরে, গুপ্তভাবে জয়মলকে বধ করে চিতোর অধিকার' করেছেন। মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ 'ন্যায়-যুদ্ধে' চিতোর পুনরধিকার করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু প্রতাপের ছোট ভাই শক্তসিংহ ভিন্ন ধাতুর মানুষ। তিনি মনে করেন, প্রতাপ মেবারের রাণা। দেশের জন্য রাণা জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করবেন কেন? প্রতাপ দেশপ্রেমিক ও বীর। অপরদিকে শক্তসিংহ লোভী ও নিষ্ঠুর। চরিত্র ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর এই পার্থক্যই এঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করেছে।]

চরিত্রলিপি

প্রতাপসিংহ—মেবারের রাণা
শক্তসিংহ—প্রতাপের ভ্রাতা
প্রতাপের কুলপুরোহিত

স্থান—চিতোরের সন্নিহিত ভয়াবহ পরিত্যক্ত বন। কাল—প্রভাত।

[শস্ত্রধারী শক্তসিংহ বামপার্শ্বস্থ শ্বাপদকঙ্কালের দিকে চাহিতে চাহিতে ধীর-পদক্ষেপে প্রবেশ করিলেন।]

প্রতাপ। দেখে এলে ?

শক্ত। হাঁ দাদা।

প্রতাপ। কী দেখলে ?

শক্ত। স্থান পরিত্যক্ত।

প্রতাপ। জনমানব নাই ?

শক্ত। জনমানব নাই।

প্রতাপ। কারণ ?

শক্ত। কারণ জিজ্ঞাসা কর্বার লোক নাই।

প্রতাপ। মন্দিরের পুরোহিত কোথায় ? তিনিই মোগল-সৈন্যের আগমন-সংবাদ আমাকে দিয়েছিলেন। তিনি কোথায় ?

শক্ত। আবাসে নাই।

প্রতাপ। তবে আমাদের আগমন নিষ্ফল।

শক্ত। নিষ্ফল কেন ? এখানে অনেক বন্যপশু আছে। এস ব্যাঘ্র-শিকার করি।

প্রতাপ। শেষে ব্যাঘ্র-শিকার !

শক্ত। নৈলে আর কি করা যায় ! এমন সুন্দর প্রভাত। এমন নিস্তব্ধ অরণ্য, এমন ভয়াবহ নির্জন পথ। এ সৌন্দর্য পূর্ণ কর্তে রক্ত চাই। যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।

প্রতাপ। বিনা উদ্দেশ্যে রক্তপাত!

শক্ত। ভল্ল নিক্ষেপ অভ্যাস করাই উদ্দেশ্য হোক। আজ দেখবো দাদা, কে ভল্ল নিক্ষেপ কর্তে ভালো পারে—তুমি কিংবা আমি।

প্রতাপ। প্রমাণ কর্তে চাও?

শক্ত। হাঁ। [স্বগত] দেখি, তুমি কি স্বত্বে মেবারের রাণা, আমি যার কৃপাদত্ত অন্নে পরিপুষ্ট!

প্রতাপ। আচ্ছা চল। তাই প্রমাণ করা যাক্। শিকার, ক্রীড়া দুই হবে।

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

[দৃশ্য পরিবর্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত একটি মৃত ব্যাঘ্র দেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন।]

প্রতাপ। ও বাঘ আমি মেরেছি।

শক্ত। আমি মেরেছি।

প্রতাপ। এই দেখ আমার ভল্ল।

শক্ত। এই আমার ভল্ল।

প্রতাপ। আমার ভল্লে ও মরেছে।

শক্ত। আমার ভল্লে।

প্রতাপ। আচ্ছা, চল ঐ বন্য-বরাহ লক্ষ্য করি।

শক্ত। সমান দূর থেকে মার্তে হবে।

প্রতাপ। আচ্ছা।

উভয়ে সে বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

[দৃশ্য পরিবর্তন—বনান্তর। প্রতাপ ও শক্ত।]

শক্ত। বরাহ পালিয়েছে।

প্রতাপ। তবে কারও ভল্ল লাগেনি।

শক্ত। না।

প্রতাপ। তবে কিছুই প্রমাণ হোলো না—আজ থাক্, বেলা হয়েছে, আর একদিন দেখা যাবে।

শক্ত। আর একদিন কেন দাদা! আজই প্রমাণ হয়ে যাক্ না।

প্রতাপ। কি রকমে?

শক্ত। এস, পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করি।

প্রতাপ। সে কি শক্তসিংহ?

শক্ত। ক্ষতি কি?

প্রতাপ। না শক্ত—কাজ নাই, এতে লাভ কি হবে?

শক্ত। লোকসানই বা কি? হদ্দ দেহের একটু রক্তপাত বৈ ত নয়। দেহে বর্ম আছে। মর্বো না কেউই—ভয় কি!

প্রতাপ। মর্বার ভয় করি না শক্ত।

শক্ত। না না, নেও ভল্ল! আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি—অন্ততঃ ফোঁটা দুই নররক্ত চাই। নেও ভল্ল, নিক্ষেপ কর। [চীৎকার করিয়া] নিক্ষেপ কর।

প্রতাপ। উত্তম—নিক্ষেপ কর।

শক্ত। একসঙ্গে নিক্ষেপ কর।

উভয়ে ভূমিতলে তরবারি রাখিলেন। পরে উভয়ে পরস্পরের দিকে ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে প্রতাপের কুলপুরোহিত প্রবেশ করিয়া উভয়ের অন্তর্বর্তী হইয়া কহিলেন।—

"এ কি! ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! ক্ষান্ত হও।"

শক্ত। না না ব্রাহ্মণ! দূরে থাক! নইলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

পুরোহিত। মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

শক্ত। কখনও না। নররক্ত নিতে বেরিইছি। নররক্ত চাই।

পুরোহিত। নররক্ত চাও ? এই নাও, আমি দিচ্ছি।

এই বলিয়া পুরোহিত ভূমি হইতে শক্তের পরিত্যক্ত তরবারি লইয়া স্বীয় বক্ষে তরবারি আঘাত করিয়া ভূমিতলে পড়িলেন।

প্রতাপ। এ কি গুরুদেব! কি কর্লে তুমি!

পুরোহিত। কিছু না।—প্রতাপ! শক্ত! তোমাদের ক্ষান্ত কর্বার জন্য এ কাজ করেছি।

প্রতাপ। কি কর্লে শক্ত ?

শক্ত। [উদ্‌ভ্রান্তভাবে] সত্যিই ত। কি কর্লাম!

প্রতাপ। শক্ত! তোমার জন্যই সম্মুখে এই ব্রহ্মহত্যা হোলো। শুনেছিলাম যে, তোমার কোষ্ঠিতে আছে যে, তুমিই একদিন মেবারের সর্বনাশের কারণ হবে। এতদিন তা বিশ্বাস হয়নি। আজ বিশ্বাস হোলো।

শক্ত। আমার জন্য এই ব্রহ্মহত্যা হোলো!

প্রতাপ। তোমাকে নিরাশ্রয় দেখে, আমি আদর করে, মেবারে এনেছিলাম! কিন্তু মেবারের সর্বনাশের হেতুকে আর মেবারে রাখতে পারি না। তুমি এই মুহূর্তে রাজ্য পরিত্যাগ কর।

শক্ত। উত্তম!

প্রতাপ। যাও। আমি এখন এ ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা করি ; পরে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব। যাও।

উভয়ে বিপরীতদিকে প্রস্থান করিলেন।

[রাণা প্রতাপসিংহ]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

মেবার—রাজপুতানার (বর্তমান রাজস্থানের) অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে একসময় বিখ্যাত ছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামের কীর্তিকথায় মেবারের

ইতিহাস গৌরবময়।
শ্বাপদ—হিংস্র বা শিকারী জন্তু।
বরাহ—শূকর। হদ্দ—বড়জোর।
ব্রহ্মহত্যা—ব্রাহ্মণ-বধ।
শস্ত্র—আয়ুধ, অস্ত্র।
ভল্ল—বর্শাজাতীয় অস্ত্রবিশেষ।
বর্ম—আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য দেহাবরণ।

অনুশীলনী

১। প্রতাপসিংহ কে? শক্তসিংহের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক? চিতোরের সন্নিহিত বনে শক্তসিংহ কী দেখে এলেন? রক্তের নেশা যে তাকে পেয়ে বসেছে, নাট্যাংশে তার ইঙ্গিত সর্বপ্রথম আমরা কোথায় পাই?

২। "যখন মনুষ্য-রক্ত পাচ্ছি না, তখন পশুর রক্তপাত করা যাক্।"—এটি কার উক্তি? কাকে উদ্দেশ্য করে? বাঘ ও বন্য-বরাহ-শিকারকে উপলক্ষ করে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কী কথোপকথন হয়েছিল?

৩। "আমরা দুজনে আজ নররক্ত নিতে বেরিইছি"—'আমরা দুজনে' বলতে এখানে কাদের বোঝান হয়েছে? কোন্ প্রসঙ্গে কোথায় এই উক্তি? নররক্ত নেয়া শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল কি? যদি হয়ে থাকে তো কীভাবে?

৪। মেবারের কুলপুরোহিত স্বীয় বক্ষে তরবারির আঘাত করলেন কেন? প্রতাপ ও শক্ত তখন কী বললেন? কী করলেন? কুলপুরোহিতের চরিত্র নিজের ভাষায় অংকন করো।

৫। 'রক্তের নেশা' কাকে কীভাবে আচ্ছন্ন করেছিল? এ-নেশার কী পরিণতি দাঁড়াল, আলোচনা কর।

৬। প্রতাপ ও শক্তসিংহ চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর। এঁদের মধ্যে কোন্ চরিত্রটিতে তোমার বেশি ভালো লাগে তা যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে বলো।

৭। এই নাট্যাংশে মোট ক'টি দৃশ্য আছে? শেষ দৃশ্যের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখ।

৮। কোন্‌টি কার উক্তি, বলো ঃ

(ক) স্থান পরিত্যক্ত। (খ) শেষে ব্যাঘ্র-শিকার! (গ) প্রমাণ কর্তে চাও? (ঘ) মৃত্যুকে ভয় করি না—ক্ষান্ত হও।

৯। ব্যাখ্যা লিখ ঃ

(ক) কারণ জিজ্ঞাসা……নাই। (খ) এমন সুন্দর……রক্ত চাই। (গ) হাঁ। দেখি,……পরিপুষ্ট। (ঘ) শুনেছিলাম যে,……বিশ্বাস হোলো।

১০। অর্থ বলো ঃ

সন্নিহিত, পরিত্যক্ত, শস্ত্রধারী, শ্বাপদকঙ্কাল, ভল্ল, নিষ্ক্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, ব্রহ্মহত্যা।

১১। 'রক্তের নেশা' নাট্যাংশের প্রথম দৃশ্যের বিভিন্ন উক্তির কোন্‌টি কী ধরনের বাক্য বলো।

১২। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) ঃ

(ক) 'রক্তের নেশা' নাট্যাংশটি পড়ে তোমার মানসিক অবস্থা কী দাঁড়ায়? তোমার নিজের নেশা কী?

(খ) কোন্ নাটক থেকে 'রক্তের নেশা' নাট্যাংশটি গৃহীত? তোমার জানা যে কোন পাঁচটি বাংলা নাটকের নাম বলো।

(গ) কী তোমার পছন্দ?—নাটক দেখা? না নাটক করা? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
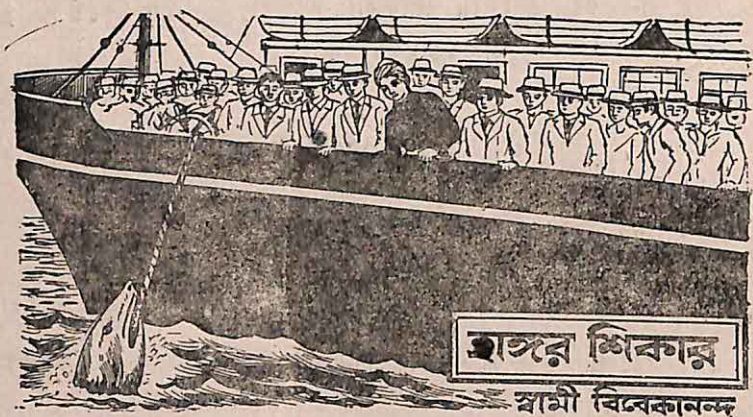
[ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ) ভারতের ইতিহাসে সমাজসেবার এক নূতন আদর্শ স্থাপন করেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবাই তাঁর আদর্শের মূলমন্ত্র। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান ও পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। এ-রচনাটি হল তাঁর 'পরিব্রাজক' (১৯০৩ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থের 'সুয়েজখালে : হাঙ্গর শিকার' অধ্যায়ের অংশ।]

রেড-সী পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পোঁছুল।...

এটি বড় প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিনদিকে বালির ঢিপি আর পাহাড়—জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে।......

সেকেণ্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক—তার তো উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শির যোগাড় করলে, সে 'কুয়োর ঘটি তোলার ঠাকুরদাদা'। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর ক'রে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হ'ল।

হাত চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হ'ল। তারপর ফাতনা সুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ ক'রে জলে ফেলে দেওয়া হ'ল।...

'আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা......'— শঙ্খধ্বনি তো শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন 'পাইলট্ ফিস্', আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাব্ড়া'; তার আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ ক'রে তেল ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটেছে, তা 'থ্যাব্ড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য—সাদা, লাল, জরদা—এক জায়গায়! আসল ইংরেজী শুয়োরের মাংস, কালো প্রকাণ্ড বঁড়শির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে।

এবার সব—চুপ্—নোড়ো চোড়ো না; আর দেখ—তাড়াতাড়ি ক'রো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ্, চুপ্—এইবার চিৎ হ'ল—ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ্—গিলতে দাও। তখন 'থ্যাব্ড়া' অবসরক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ ক'রে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাব্ড়া' মুখ ঝেড়ে চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে—উলটো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, দে টান্—কাছি ধরে দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠল—টান্ ভাই টান্। ঐ যে— প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর! বাপ্ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হে! টান—ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেছে—ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড়—টান্। থাম্ থাম্—ও আরব পুলিশ-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো—

নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে যায়। আবার টান্—কি ভারি হে? ও মা, ও কি? তাই তো হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে ও ঝুলছে কি? ও যে নাড়ি-ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্, ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্—এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো; ভাই হুঁশিয়ার, খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার—আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড় —ধুপ্। বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ ক'রেই জাহাজের উপর প'ড়ল! সাবধানের মার নেই—ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো। ওহে ফৌজিম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। 'বটে তো'। রক্ত-মাখা গায়-কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্ দুম্ দিতে লাগলো হাঙ্গরের মাথায়, আর মেয়েরা 'আহা কি নিষ্ঠুর! মেরো না' ইত্যাদি চিৎকার করতে লাগলো—অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন ক'রে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হ'ল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন-দেহ ভিন্ন-হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো, কেমন ক'রে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো এক রাশ বেরুলো—সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হ'তে লাগলো।

[পরিব্রাজক]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

রেড-সী—লোহিত সাগর। মহাদেশ-অভ্যন্তরস্থ এই সাগর উত্তর-পূর্ব আফ্রিকাকে আরব-দেশ থেকে পৃথক করেছে। এটি লম্বায় ১,৪৬০ মাইল। এর সবচেয়ে চওড়া অংশ ১৫০ মাইল দীর্ঘ। সুয়েজ খাল—বিশ্ববিখ্যাত কৃত্রিম জলপথ; ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ফার্দিনান্দ ডি লেসেপ্‌স্‌-এর উদ্যোগে এর খননকার্য সমাপ্ত হয়। খালটির দৈর্ঘ্য ৯৯ মাইল। সুয়েজ (সুয়েজ বন্দর অর্থে)—সুয়েজ উপসাগরের একপ্রান্তে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত বন্দর। সুয়েজ উপসাগরের অবস্থান লোহিত সাগরের উত্তর-প্রান্তে।

হাঙ্গর—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে তিমি ছাড়া এত বিরাট প্রাণী আর নেই। তিমি-হাঙ্গর ৭০ ফুট অবধি লম্বা হয়। মাছ এমনকি মানুষ পর্যন্ত এদের খাদ্য। ফৌজি (ফৌজী অর্থে)—সামরিক, জঙ্গী।

ফাতনা—ছিপের সুতায় বাঁধা সোলা। ভগীরথ—প্রজাবৎসল ধর্মপ্রাণ সম্রাট, সগররাজার বংশধর। পিতার নাম দিলীপ। মহর্ষি কপিলের শাপে ভস্মীভূত ষাট হাজার সগর-সন্তানের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রচেষ্টায় গঙ্গা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আগমন করলে তাঁর পূর্বপুরুষরা শাপমুক্ত হন। থ্যাব্‌ড়া—এখানে বিরাটকায় হাঙ্গর প্রসঙ্গে। খোসবু—সুগন্ধ।

জরদা—হলদে, পীত। গোপী—গোপনারী, গোয়ালিনী।

মোদ্দা—আসল, প্রকৃত, স্থূলতঃ। আড়—তেরছা, বাঁকা।

কড়িকাঠ—ঘরের ছাদ ধারণের কাঠ। দরিয়া—সমুদ্র।

অনুশীলনী

১। সুয়েজ বন্দর দেখতে কীরকম? সেখানকার জলে কী ভেসে বেড়াচ্ছিল?

২। 'ফৌজি' লোকটি কী করল, সংক্ষেপে বলো।

৩। 'থ্যাব্ড়া'টি আসলে কে? তার আগে আগে এবং আশেপাশে কা'রা ছিল? দলবলসহ 'থ্যাব্ড়া'কে কেমন দেখাচ্ছিল?

৪। "আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা···।"—কী বুঝলে? কথাটির আসল মানে এখানে কী?

৫। "রঙ-বেরঙের গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্চে!"—কথাটির মানে? কে দোল খেল এবং কেমন করে, বুঝিয়ে বলো।

৬। 'থ্যাবড়া' বঁড়শির কাছে এসে প্রথমে কী করল? কেমন করে বঁড়শি তার গলায় বিঁধল?

৭। হাঙ্গরকে কেমন করে জাহাজে তোলা হল? তুলবার পর 'ফৌজি' লোকটি কী করেছিল? মেয়েরা কী করল?

৮। 'বীভৎস কাণ্ড'টি এখানে কী, সংক্ষেপে বলো। এই 'কাণ্ড' দেখে লেখকের কী অবস্থা হয়েছিল?

৯। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:

(ক) সেকেণ্ড কেলাসের — বড়ই —। (খ) টোপটা মুখে — নেড়ে-চেড়ে —। (গ) সব — সেই — গন্ধ বোধ হ'তে লাগলো।

১০। নীচের বাক্যাংশগুলিতে ভুল থাকলে শুদ্ধ করে লিখ:

(ক) এটি বড় প্রাকৃতিক শহর, (খ) জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে বেড়াচ্চে। (গ) নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরুল যে!

১১। অর্থ লিখ: বন্দর, 'কুয়োর ঘটি তোলার ঠাকুরদাদা', ফাতনা, 'পাইলট ফিস্', খোসবু, গোপীমণ্ডলমধ্যস্থ, টোপ, উদরস্থ, বিস্মিত, কড়িকাঠ, ফৌজি-ম্যান, বীভৎস, অস্ত্র।

১২। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) "সে 'কুয়োর······ঠাকুরদাদা'।" (খ) 'আগে যান··· যান গঙ্গা······' (গ) 'জলের মধ্যে······দোল খাচ্চে!'

১৩। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) হাঙ্গর ছাড়া আর কী শিকারের গল্প তুমি জানো? যে কোনো একটি গল্প সংক্ষেপে বলো। (খ) কে বড়? হাঙ্গর, না তিমি? এ-সম্পর্কে তোমার ধারণা বুঝিয়ে বলো।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[বাংলার সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯ খ্রীঃ) একটি অগ্রগণ্য নাম। বিজ্ঞান ও দর্শনের অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখে মাতৃভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনারই মূলে জ্বলন্ত দেশপ্রেম। এই দেশপ্রেমের পরিচয় উদ্ধৃত রচনাটিতেও সুস্পষ্ট। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। লর্ড কার্জনের নির্দেশে সেদিন বাঙ্গালীর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গ-বিভাগের ব্যবস্থা হল। বঙ্গ-বিভাগের দিন অপরাহ্ণে আচার্য ত্রিবেদীর জন্মস্থান জেমো-কান্দির বাড়িতে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পড়া হয়। পড়েন আচার্য ত্রিবেদীর কন্যা গিরিজা দেবী। সে সময় ত্রিবেদী-বাড়িতে পাঁচ শতাধিক পুরনারী উপস্থিত ছিলেন।]

বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়্‌লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ কর্‌লেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হ'লেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশ্‌লেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান

কর্‌লেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরম সুখে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময় মর্ত্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম-কর্ম ছাড়্‌তে লাগ্‌ল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদ-বিধি অমান্য কর্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী চঞ্চলা ; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাব্‌লেন—হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী ; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়্‌তে হ'ল। তখন বাঙলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী ; বাঙলায় অনাচার ঘটেছে ; আমি বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেম। রাজা কেঁদে বল্‌লেন, —না মা, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না ; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি কর্‌ছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব'সে পশ্চিমদেশে কনোজে লোক পাঠালেন ; কনোজ থেকে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচজন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাঙলাদেশে বেদ-বিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদ-বিধি সদাচার ফিরে এল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা ; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। বাঙলার ধন দেখে ধান দেখে মোছলমান বাঙলায় এলেন। তখন বাঙলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাঙলার রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতিধর্ম নষ্ট হ'তে

লাগ্‌ল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মস্‌জিদ্‌ তুল্‌তে লাগ্‌লেন। অর্ধেক হিঁদু মোছলমান হ'ল। হিঁদু মোছলমানে এক গাঁয়ে, এক ঠাঁয়ে বাস ক'রে মারামারি-কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী ভাব্‌লেন, হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়্‌তে হ'ল। তখন বাঙলাতে গৌড়ের পাঠান-বাদশা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হোসেন শা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমার হিঁদুও যেমন, মোছলমানও তেমনি; হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি-কাটাকাটি করতে লাগ্‌ল, আমি বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেম। পাঠান রাজা কেঁদে বল্‌লেন—মা, তুমি যেতে পাবে না; আমি হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌ব; তাদের ভাই-ভাই একঠাঁই কর্‌ব; তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বল্‌লেন—আচ্ছা, তাই হবে; আমি এখন থাক্‌ব; দিল্লীতে মোগল বাদশা হবেন। দিল্লীর বাদশা বাঙলার রাজা হবেন; সেই রাজা হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌বেন; তখন হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙ্গে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য ক'রে রাজমন্ত্রী কর্‌লেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় সিন্নি দিতে লাগ্‌ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হ'লেন। তিনি যবন ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগল বাদশা বাঙলার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া-বিবাদ মিটে গেল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

[বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

প্রয়াগ—এলাহাবাদের প্রাচীন নাম। আর্যরা গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে যে সব উপনিবেশ স্থাপন করে প্রয়াগ তাদের অন্যতম। এটি একটি পবিত্র তীর্থ। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এখানে এসে মিলিত হয়েছে, এই ধারণা থেকে এর নাম হয়েছে ত্রিবেণী। এখানে প্রতি ১২ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা এবং ৬ বৎসর অন্তর অর্ধকুম্ভ মেলা হয়।

কাশী—বারাণসীর অন্য নাম। শোনা যায় ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কাশ নামক এক রাজা এই নগরীর পত্তন করেন। কাশী ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন শহরগুলির অন্যতম। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই নগরী হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ।

বেদবিধি—প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্র বেদ-এ নির্দেশিত ক্রিয়াকর্মসমূহ। বেদের অপর নাম শ্রুতি। ঋষিরা বেদ-এর রচয়িতা নন, দ্রষ্টা বা শ্রোতা মাত্র। বেদ চার প্রকার: ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। প্রতিটি বেদ-এর চার ভাগ —(১) সংহিতা বা মন্ত্রাংশ; (২) ব্রাহ্মণ; (৩) আরণ্যক; (৪) উপনিষদ্।

আদিশূর—গৌড়ের সম্রাট। বাংলাদেশে কুলশাস্ত্র নামক গ্রন্থাবলী আদিশূরকে কেন্দ্র করে রচিত। এই গ্রন্থাবলী থেকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি নানা জাতির উৎপত্তি ও বিকাশের বিবরণ জানা যায়।

কনোজ—কান্যকুব্জ; উত্তর প্রদেশের ফতেগড় জেলার অন্তর্গত।

লক্ষ্মণ সেন—বাংলার সেন-বংশের বিখ্যাত সম্রাট। বল্লাল সেনের পুত্র। তিনি ১১৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড়, কলিঙ্গ (পুরী), কামরূপ, গয়া, ছোটনাগপুর ও প্রয়াগে তাঁর শাসন বিস্তৃত হয়।

সিন্নি—চিনি-ঘটিত মিষ্টান্ন (ফার্সী শিরনী থেকে)। শতদল—শতসংখ্যক পাপড়ি, পদ্ম।

অনুশীলনী

১। বাংলার উত্তর ও দক্ষিণ-সীমায় কী আছে? এই দেশ কীভাবে গড়ে উঠল? গঙ্গার সঙ্গে এ-দেশের সম্পর্ক কী? এদেশে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান সম্পর্কে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

২। "এমন সময় মর্ত্যে কলির উদয় হ'ল।"—এখানে কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে? 'কলির উদয়' বলতে রামেন্দ্রসুন্দর কী বুঝিয়েছেন?

৩। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' অনুসরণে আদিশূরের কাহিনী বর্ণনা কর। কীভাবে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বসলেন?

৪। "লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন।"—কোথায়, কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? লক্ষ্মী চঞ্চলা হবার পর কী ঘটল? হোসেন শা কীভাবে লক্ষ্মীকে বশে আনলেন? বশে আনবার পর দেশের কী অবস্থা দাঁড়াল?

৫। "হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া-বিবাদ মিটে গেল।"—কখন্ কীভাবে এরূপ ঘটল, 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' অনুসরণ করে বুঝিয়ে দাও।

৬। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'য় দেশাত্মবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তা প্রকাশ করো। 'বঙ্গলক্ষ্মী' বলতে এখানে কী বোঝান হয়েছে?

৭। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) মা গঙ্গা……দেশ গড়্লেন। (খ) চিরদিন……চঞ্চল হলেন। (গ) হিঁদু গিয়ে……দিতে লাগ্ল।

৮। টীকা লিখ: বন্দে মাতরম্, প্রয়াগ-কাশী, বেদবিধি, আদিশূর, কনোজ, লক্ষ্মণ সেন, হোসেন শা, মহাপ্রভু।

৯। অর্থ বলো: শতমুখী, শতদল, সজ্জন, ঠাঁই।

১০। নিম্নোক্ত বাক্য দু'টিকে সাধুভাষায় প্রকাশ কর:

মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন।

১১। নিম্নোক্ত বাক্য দু'টিকে একটি বাক্যে পরিণত কর:

পাঠানের পর দিল্লীর মোগল বাদশা বাঙলার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগ্লেন।

১২। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) ব্রতকথা বলতে কী বোঝ? 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'কে কোন্ অর্থে ব্রতকথা বলা চলে?

(খ) বর্তমান বাঙলায় বঙ্গলক্ষ্মীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তুমি কী মনে কর?

দেশবন্ধুকে অভিনন্দন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮ খ্রীঃ) বাংলা কথা-সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনীকার। সরল ও সহজ ভাষার আশ্রয়ে ভালোয়-মন্দে মেশানো সাধারণ মানুষের দুঃখ-সুখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তাঁর সাহিত্যে অমর করে রেখেছেন। এদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অন্ত নেই। উদ্ধৃত রচনাটিতে আমরা দেখি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তিনি।...১৩২৮ বঙ্গাব্দ। ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। কারামুক্তির পর কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবন্ধুকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সে-সময় দেশবাসীর পক্ষ থেকে এই অভিনন্দন-পত্রটি রচনা করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।]

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের শ্রীকরকমলেষু,—

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তিপথযাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে

তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ ; হে বরেণ্য, তোমার সেই-সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত ও পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু যে-কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজও সে তেমনই গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক্। কিন্তু, আর একদিন এই বাংলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাঙ্গলার নিগূঢ় মর্মস্থানটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়ত তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দেশ করিয়া দিতে সর্বস্ব পণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্ব-লোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে

হইল। যে-কথা তুমি বার বার বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইল,—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

এই ত তোমার ব্যথা! এই ত তোমার দান!

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না—তাই বাঙ্গলা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ তাই ত আজ তোমার করতলে। তাই ত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙ্গালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টী, গুজরাটী যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনই করিয়াই মানবজীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনই করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতি সর্বদেশে, সর্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে, বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ্, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব—বাঙ্গালী তুমি ; তাই ত সমস্ত বাঙ্গলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আসিয়াছে, —আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ,—তুমি চির-জীবী হও! তুমি জয়যুক্ত হও!

তোমার গুণমুগ্ধ—স্বদেশবাসিগণ।

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

মাতার শৃঙ্খলভার—পরাধীন ভারতবর্ষের দুঃখ-যন্ত্রণার বোঝা। অগ্রজ—এখানে অগ্রগণ্য অর্থে। স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত—স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত। গ্রহীতা—যে গ্রহণ করে। নিগূঢ়—রহস্যময়, গোপন। অন্তর-বাণী—হৃদয়ের কথা। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—"নিস্তার লাভের আর নাহিরে উপায়" (রবীন্দ্রনাথ); এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

অনুশীলনী

১। দেশবন্ধুকে নমস্কারের প্রকৃত তাৎপর্য কী? 'সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি' কেন তাঁর প্রাপ্য?

২। "আজও সে তেমনই গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক্।"—কা'কে উদ্দেশ করে কোথায় এ-কথা বলা হয়েছে? উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেখাও, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি প্রকৃতই দেশ ও জাতির পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

৩। "তাঁহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল।"—প্রসঙ্গ নির্দেশ করে এ-উক্তিটির মর্মার্থ বুঝিয়ে দাও।

৪। "বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,"—কা'কে উদ্দেশ করে কোথায় এ-কথা বলা হয়েছে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি যে প্রকৃতই বীর, দাতা ও কবি তা বুঝিয়ে দাও।

৫। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।—'দেশবন্ধুকে অভিনন্দন' প্রসঙ্গে এই উদ্ধৃতিটির সার্থকতা কোথায়? বাঙ্গলা তাঁকে বন্ধু ভেবে ভুল করে নি কেন? কেন তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' ভারতবর্ষের সকলকে নিষ্পাপ করেছে? দেশবন্ধুর 'দান' সম্পর্কে অভিনন্দন-বাণীতে কী বলা হয়েছে?

৬। 'দেশবন্ধুকে অভিনন্দন' নামক রচনায় 'জীবনতত্ত্বের' অমোঘ বাণীটি কী? কেন দেশবন্ধু বাঙ্গালীর গর্বের বস্তু?

৭। 'দেশবন্ধুকে অভিনন্দন' শীর্ষক রচনায় স্বাধীনতা-সংগ্রামী চিত্তরঞ্জন দাশের যে চরিত্র-মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে, সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

৮। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) হে বরেণ্য,…গ্রহণ কর। (খ) দাতা ও গ্রহীতার…জন্যই থাক্। (গ) রাজা তোমাকে…হার মানিয়াছে। (ঘ) বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা…দিতে হইল। (ঙ) এমনই করিয়াই…চলে। (চ) কোনমতে বাঁচিয়া…পারিবে না।

৯। অর্থ বলো:

মুক্তিপথযাত্রী, স্বেচ্ছায়, স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত, পঞ্চভূত, উপদ্রুত, জীবনতত্ত্ব, অমোঘ, চিরজীবী।

১০। উদ্ধৃত রচনাটি থেকে অন্ততঃ পাঁচটি সমাসবদ্ধ পদ বেছে নাও, তাদের ব্যাসবাক্য লিখ ও সমাস বলো।

১১। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) দেশবন্ধুর সমসাময়িক অন্ততঃ তিনজন ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নাম বলো।

(খ) দেশবন্ধুর নামাংকিত দুইটি প্রতিষ্ঠানের নাম বলো।

[এ-যুগের এক বরণীয় কথাশিল্পী বিভূভিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০০-১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। ‘পথের পাঁচালী’ (১৩৩৬), ‘অপরাজিত’ (১৩৩৮), ‘আরণ্যক’ (১৩৪৫) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায়, বিশেষ করে অরণ্য ও পল্লী অঞ্চলের চিত্র-অংকনে তিনি বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত। ‘আরণ্যক’ থেকে উদ্ধৃত এই রচনাটিতে লবটুলিয়া অঞ্চলের অরণ্য-রহস্যের একটি দিক অতি সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত। এখানে বর্ণিত অরণ্যের অবস্থান কুশীনদীর তীরে—দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার অন্তর্গত এক এলাকায়।]

ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে ঠিক দুপুর বেলা সংবাদ পাইলাম, নৈর্ঋত কোণে মাইল-খানেক দূরের জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সবাই মিলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম প্রচুর ধূমের সঙ্গে রাঙা অগ্নিশিখা লকলক করিয়া বহুদূর আকাশে উঠিতেছে! সেদিন আবার দারুণ পশ্চিমে বাতাস, লম্বা লম্বা ঘাস ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গল সূর্যতাপে অর্ধশুষ্ক হইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক-এক স্ফুলিঙ্গ পড়িবামাত্র গোটা ঝাড় জ্বলিয়া উঠিতেছে—সেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়

ঘন নীলবর্ণ ধূম্ররাশি ও অগ্নিশিখা—আর চটচট শব্দ। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের কয়খানা খড়ের বাংলোর দিকেই। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, এখানে থাকিলে তো বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল তো আসিয়া পড়িল!

ভাবিবার সময় নাই। কাছারির দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা, সরকারী দলিল, ম্যাপ, সর্বস্ব মজুত—এ বাদে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস যার যার তো আছেই! এ সব তো যায়! সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল—আগ তো আ গৈল, হুজুর! বলিলাম—সব জিনিস বার কর, সরকারী তহবিল ও কাগজপত্র আগে।

জনকতক লোক লাগিয়া গেল আগুন ও কাছারির মধ্যে যে জঙ্গল পড়ে তাহারই যতটা পারা যায় পরিষ্কার করিতে। জঙ্গলের মধ্যে বাথান হইতে আগুন দেখিয়া বাথানওয়ালা চরির প্রজা দু-দশ জন ছুটিয়া আসিল কাছারি রক্ষা করিতে, কারণ পশ্চিমা বাতাসের বেগ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে কাছারি ঘোর বিপন্ন।

কিন্তু অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, একদল বন্যশূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল—ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পলাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটাকতক সিল্লি। রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল—পানি কাঁহা নেই ছে···আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলগন? গোষ্ঠ মুহুরী

বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ বাপু রাখ্। এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়তে কি দরকার?

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পরে দশ-পনের জন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সে কি যুদ্ধ! জল কোথাও নাই—আধকাঁচা গাছের ডাল ও বালি এইমাত্র অস্ত্র। সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মত বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—এদিকে কাছারির সব জিনিসপত্র, বাক্স, খাট, দেরাজ, আলমারি তখনও টানাটানি করিয়া বাহির করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠানে ফেলা হইতেছে। কোথাকার জিনিস যে কোথায় গেল, কে তার ঠিকানা রাখে! মুহুরীবাবুকে বলিলাম—ক্যাশ আপনার জিম্মায় রাখুন, আর দলিলের বাক্সটা।

কাছারির উঠান ও পরিস্কৃত স্থানে বাধা পাইয়া আগুনের স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ বাহিয়া নিমেষের মধ্যে পূর্বমুখে ছুটিল—কাছারিটা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল এযাত্রা। জিনিসপত্র আবার ঘরে তোলা হইল, কিন্তু বহুদূরে পূর্বাকাশ লাল করিয়া লালজিহ্বা প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা সারা রাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সকালের দিকে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানায় গিয়া পৌঁছিল।

দু-তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেল কারো ও কুশী নদীর তীরবর্তী কর্দমে আট-দশটা বন্যমহিষ, দুটি চিতা বাঘ, কয়েকটা নীল গাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে। ইহারা আগুন দেখিয়া মোহনপুরা জঙ্গল হইতে প্রাণভয়ে নদীর ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাবড়ে পড়িয়া গিয়াছে—যদিও রিজার্ভ ফরেস্ট হইতে কুশী ও কারো নদী প্রায় আট-ন' মাইল দূরে।

[আরণ্যক]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

দাবানল—দাবের (বনের) অনল (অগ্নি), বন দহনকারী অগ্নি।
নৈঋর্ত কোণ—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। ডাক-গাড়ীর বেগে—অত্যন্ত দ্রুতবেগে। বাথান—গৃহপালিত গবাদির বাসস্থান, গোচারণের মাঠ।
নীলগাই—কৃষ্ণসার জাতীয়; ঘন নীলাভ ধূসরবর্ণ পশুবিশেষ।
হাবড়—জল-কাদা, কাদামাটি।

অনুশীলনী

১। "এখানে থাকিলে তো বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল তো আসিয়া পড়িল!"—কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য, বিশদ করে বুঝিয়ে দাও।

২। দাবানল দেখে ভীত মানুষরা কে কী করেছিল, বর্ণনা কর।

৩। দাবানলকে দূর থেকে কীরকম দেখাচ্ছিল? বন্য পশু ও পাখিদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কী? লাল হাঁস দেখে রামবিরিজ সিং অবাক হ'ল কেন? গোষ্ঠ মুহুরী কেন তাঁর কথায় বিরক্ত হ'ল?

৪। দাবানলের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধের দৃশ্যটি বর্ণনা কর। এ-যুদ্ধের কী পরিণতি ঘটল?

৫। 'দাবানল' রচনাটিতে প্রকৃতি কীভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, দেখিয়ে দাও।

৬। প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনায় বিভূতিভূষণ যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, 'দাবানল' রচনাটির সাহায্যে তা প্রমাণ কর।

৭। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) ঝড়ের মুখে···বাংলোর দিকেই। (খ) এখন প্রাণ নিয়ে···কি দরকার?

৮। 'দাবানল' রচনাটি থেকে পাঁচটি তৎসম শব্দ, তিনটি বিশেষণ ও দু'টি অব্যয় খুঁজে বের কর।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) 'দাবানল' ছাড়া বিভূতিভূষণের আর কী রচনা তুমি পড়েছ?

(খ) 'দাবানল' কীভাবে সৃষ্টি হয়?

[স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭—?) একটি অবিস্মরণীয় নাম। দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির জন্যে তাঁর সারা জীবনের ত্যাগ ও তপস্যাকে ভারতবাসী মাত্রেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। প্রগাঢ় দেশপ্রেম ও জাগ্রত আত্মসম্মানবোধ ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এ-রচনাটিতেও তার প্রমাণ মিলবে। এ-রচনাটি মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেন সুভাষ সেন। এ হল সুভাষচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'ভারত পথিক'-এর একটি অংশ।]

১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাস তখন। সকালে কলেজ লাইব্রেরিতে বসে পড়ছি এমন সময়ে খবর পেলাম জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে মারধোর করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আমাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে মিঃ ওটেনের ঘরের সামনের বারান্দায় পায়চারি করছিল, এতে বিরক্ত হয়ে মিঃ ওটেন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েকজন ছেলেকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। ক্লাসের প্রতিনিধি হিসেবে আমি তৎক্ষণাৎ অধ্যক্ষ মিঃ এইচ. আর. জেমসের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানালাম, বললাম—যে-ছেলেদের মিঃ ওটেন অপমান করেছেন, তাঁদের কাছে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। অধ্যক্ষ বললেন, তাঁর পক্ষে মিঃ ওটেনকে ক্ষমা

চাইতে বাধ্য করা সম্ভব নয়, কারণ মিঃ ওটেন ইণ্ডিয়ান এডুকেশনল সার্ভিস-এর লোক। তাছাড়া তিনি বললেন, মিঃ ওটেন তো কাউকেই মারধোর করেননি, শুধু হাত ধরে সরিয়ে দিয়েছেন—এতে অপমানিত বোধ করার কিছু নেই। জবাবদিহি শুনে আমরা মোটেই খুশি হতে পারলাম না। পরের দিন ছাত্ররা ধর্মঘট করল। অধ্যক্ষ বহু চেষ্টা করেও ধর্মঘট ভাঙতে পারলেন না, এমন কি মৌলবী সাহেবের প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুসলমান ছেলেরা ধর্মঘট থেকে বিরত হল না। স্যর পি. সি. রায় এবং ডক্টর ডি. এন্ মল্লিক—এঁদের অনুরোধেও কেউ কর্ণপাত করল না। যেসব ছেলেরা ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল অধ্যক্ষ তাদের প্রত্যেককে জরিমানা করলেন।

প্রেসিডেন্সির মতো কলেজে এ রকম জোরালো একটি ধর্মঘটের খবর শহরের চতুর্দিকে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি করল। ধর্মঘটের ঢেউ যখন আস্তে আস্তে আরো কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। একজন অধ্যাপক আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তিনি ভয় পেলেন ধর্মঘটের পাণ্ডা হিসেবে আমাকে হয়তো অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। আড়ালে ডেকে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্মঘটের ফল কী হতে পারে আমি ভেবে দেখেছি কি না। জবাবে আমি যখন বললাম, ভেবে দেখেছি, তিনি আর কথা বাড়ালেন না। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন পূর্ণ হলে কর্তৃপক্ষ মিঃ ওটেনের উপর চাপ দিলেন। মিঃ ওটেন তখন ছাত্র প্রতিনিধিদের ডেকে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ব্যাপারটা ভালোভাবেই মিটমাট করে ফেললেন। দুপক্ষেরই সম্মান বজায় রইল। পরের দিন ক্লাস বসল। যা হবার হয়ে গেছে—এই মনোভাব নিয়ে ছেলেরা যে-যার ক্লাস করতে লাগল। সকলেই আশা করেছিল ব্যাপারটা যখন মিটমাটই হয়ে গেছে তখন ধর্মঘটের সময়ে যেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

করা হয়েছিল এবার সেগুলি রদ করা হবে। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে দেরি হল না। অধ্যক্ষ মহাশয় জরিমানা মাপ করতে কোনোমতেই রাজী ছিলেন না। তবে, গরিব বলে কেউ ওজর দেখালে, তিনি তাকে মাপ করতে রাজী ছিলেন। ছাত্র, অধ্যাপক কারুর অনুরোধেই তিনি কর্ণপাত করলেন না। ছেলেদের মেজাজ গেল বিগড়ে, কিন্তু তখন আর কিছু করবার ছিল না।

মাসখানেক পরে আবার ওইরকম একটি ব্যাপার ঘটল। খবর পাওয়া গেল—মিঃ ওটেন আবার একটি ছেলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, এবারকার ছেলেটি প্রথম বার্ষিকের ছাত্র। ছাত্ররা চট্ করে বুঝে উঠতে পারল না, এ অবস্থায় কী করা দরকার। আইন-সম্মতভাবে ধর্মঘট ইত্যাদি করলে কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, আর অধ্যক্ষের কাছে নালিশ করলে কোনো ফলই হবে না। অগত্যা কয়েকটি ছেলে স্থির করল তারা নিজেরাই এর ব্যবস্থা করবে। ফলে মিঃ ওটেন ছাত্রদের হাতে বেদম মার খেলেন। খবর পেয়ে খবরের কাগজের অফিস থেকে শুরু করে লাটভবন পর্যন্ত ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল।

ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা নাকি মিঃ ওটেনকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে সিঁড়ি দিয়ে ফেলে দিয়েছে। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। পেছন থেকে একবারই মাত্র তাঁকে আঘাত করা হয়েছিল, কিন্তু সেও এমন কিছু মারাত্মকভাবে নয়। তাঁকে যারা ঘায়েল করেছিল তারা সকলেই ছিল তাঁর সামনে। ব্যাপারটা আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম, কাজেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল জোর গলায় তার প্রতিবাদ করছি।

[ভারত পথিক]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

জবাবদিহি—কৈফিয়ৎ।

স্যর পি. সি. রায়—প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১—১৯৪৪ খ্রীঃ) এদেশের একজন স্মরণীয় মনীষী। রসায়ন-বিজ্ঞানী হিসেবে তো বটেই, সমাজসেবী হিসেবেও তিনি অনন্যসাধারণ। আধুনিক যুগে ভারতে রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রথম ভারতীয় প্রবর্তক।

সন্ত্রস্ত—অতিশয় ভীত।

অনুশীলনী

১। "খবর পেলাম জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক আমাদের ক্লাসের একটি ছেলেকে মারধোর করেছে।"—ইংরেজ অধ্যাপকটি কে? তিনি কা'দের ক্লাসের ছেলেকে মারধোর করলেন এবং কেন করলেন? এ-সম্পর্কে ক্লাসের প্রতিনিধির প্রতিবাদের উত্তরে কলেজের অধ্যক্ষ কী বলেছিলেন? অধ্যক্ষের জবাব শুনে ছাত্ররা কী করল?

২। "পরের দিন ছাত্ররা ধর্মঘট করল।"—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ছাত্র-ধর্মঘটের কারণ নির্দেশ কর। এই ধর্মঘট ভাঙবার জন্যে কী কী চেষ্টা হয়েছিল?

৩। প্রেসিডেন্সী কলেজের কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন কেন? ওখানকার উত্তেজনার 'পাণ্ডা' কে ছিল? তাকে শান্ত করার জন্যে 'একজন অধ্যাপক' কী করলেন? কী করে উত্তেজনা সাময়িকভাবে প্রশমিত হল?

৪। "কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে দেরী হল না।"—কোন্ প্রসঙ্গে কা'দের উপলক্ষ করে এ-কথা বলা হয়েছে?

৫। "মাসখানেক পরে আবার ওইরকম একটি ব্যাপার ঘটল।"—এখানে কোন্ 'ব্যাপার'-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? প্রকৃত ব্যাপারটি কী, সুভাষ-চন্দ্রের বর্ণনা অনুসরণ করে বুঝিয়ে দাও।

৬। 'প্রতিবাদ' নামক রচনায় সুভাষচন্দ্রের যে তেজস্বিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

৭। প্রবন্ধটির 'প্রতিবাদ' নামকরণের সার্থকতা কোন্‌খানে?—রচনাটি অনুসরণ করে বুঝিয়ে দাও।

৮। প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :
কাজেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে……প্রতিবাদ করছি।

৯। অর্থ বলো :
ইণ্ডিয়ান এডুকেশনল সার্ভিস, জবাবদিহি, সন্ত্রস্ত, দুর্ব্যবহার।

১০। উদ্ধৃত রচনাটি থেকে পাঁচটি ক্রিয়া ও তিনটি ক্রিয়া-বিশেষণ খুঁজে বের কর।

১১। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :

(ক) সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' বলা হয় কেন? তিনি কবে কোথায় জন্ম-গ্রহণ করেন?

(খ) আই. এন্. এ. কী? স্বাধীনতা-সংগ্রামের শুরুতে সুভাষচন্দ্রের গুরু কে ছিলেন?

[তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮—১৯৭১ খ্রীঃ) বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের অন্যতম। তাঁর রচনায় রাঢ়-বীরভূম অঞ্চলের মাটি, মানুষ, উৎসব-অনুষ্ঠান ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন্ত। উদ্ধৃত রচনাটিতে রূপকের মাধ্যমে পৌষলক্ষ্মীর কাহিনী ও তাঁর পূজানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। এ-রচনাটি তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'গণদেবতা'র অংশবিশেষ।]

সেই পুরাকালে ছিল এক রাখাল ছেলে। বনের ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সে আপনার গরুগুলিকে লইয়া চরাইয়া ফিরিত। গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের বাতাস তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে দুঃখ-কষ্ট হইলে সে চোখের জল ফেলিত, আর উর্ধ্বমুখে দেবতাকে ডাকিত—ভগবান, আর পারি না, এ কষ্ট তুমি দূর কর, আমাকে বাঁচাও।

একদিন লক্ষ্মী-নারায়ণ চলিয়াছিলেন আকাশ-পথে। রাখালের কাতর কান্না আসিয়া পৌঁছিল তাঁহাদের কানে। মা-লক্ষ্মীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। দূর কর ঠাকুর, রাখালের দুঃখ দূর কর।

নারায়ণ হাসিলেন। বলিলেন—এ দুঃখ দূর করিবার শক্তি তো আমার নাই লক্ষ্মী, সে শক্তি তোমার।

লক্ষ্মী বলিলেন—তুমি অনুমতি দাও!

নারায়ণের অনুমতি লইয়া লক্ষ্মী আসিলেন মর্ত্যে। চারিদিক হাসিয়া উঠিল—সোনার বর্ণচ্ছটায়, বাতাস ভরিয়া উঠিল দেবীর দিব্যাঙ্গের অপরূপ সৌরভে! রাখাল অবাক হইয়া গেল। দেবী রাখালের কাছে আসিয়া বলিলেন—দুঃখ তোমার দূর হইবে, তুমি আমার কথামত কাজ কর। এই লও ধানের বীজ; বর্ষার সময় মাঠে এইগুলি ছড়াইয়া দাও, বীজ হইতে গাছ হইবে। সেই গাছের বর্ণ যখন হইবে আমার দেহ-বর্ণের মতো, আমার গাত্র-গন্ধের মতো গন্ধে যখন ভরিয়া উঠিবে তাহার সর্বাঙ্গ, তখন সেগুলি কাটিয়া ঘরে তুলিবে।

রাখাল লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। বর্ষায় প্রান্তরের বুকে ছড়াইয়া দিল ধানের বীজ; দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাঠ ভরিয়া গেল সবুজ ধানের গাছে। ক্রমে ক্রমে বর্ষা গেল—সবুজ ধানের ডগায় দেখা দিল শীষ। রাখাল নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল, কিন্তু এখনও সেই ঠাকরুণের মতো বর্ণ হয় নাই, সে গন্ধও উঠিতেছে না! রাখাল অপেক্ষা করিয়া রহিল। হেমন্তের শেষ অগ্রহায়ণে একদিন রাত্রে ঘরে শুইয়াই রাখাল পাইল সেই গন্ধ। সকালে উঠিয়াই সে ছুটিয়া গেল মাঠে। অবাক হইয়া গেল। সোনার বর্ণে গোটা মাঠটা আলো হইয়া উঠিয়াছে, দিব্য-গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত। সোনার বর্ণে, দিব্য-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আকাশে নানাবিধ কীট-পতঙ্গ-পাখী উড়িতেছে—পশুরা আসিয়া জুটিয়াছে চারিপাশে, সেই ঠাকরুণ যেন তাহার দুঃখে বিগলিত হইয়া মাঠ জুড়িয়া অঙ্গ এলাইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ধান কাটিয়া ভারে ভারে ঘরে তুলিল।

দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া আসিয়া সোনা দিয়া কিনিতে চাহিলেন সমস্ত ধান। রাজার ভাণ্ডারের সোনা ফুরাইয়া গেল—কিন্তু রাখালের ধান অফুরন্ত। রাজার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তখন রাজা আপনার কন্যাকে আনিয়া দান করিলেন রাখালের হাতে। সম্মুখেই পৌষ-সংক্রান্তিতে রাখাল লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিল। ওই ধানকেই স্থাপিত করিল সিংহাসনে, সিন্দুর-কজ্জলে বসনে-ভূষণে তাহাকে বিচিত্র শোভায় সাজাইল, সম্মুখে স্থাপন করিল জলপূর্ণ ঘট, ঘটের মাথায় দিল ডাব—আমের পল্লব। রাজকন্যা ঐ ধান ভানিয়া চাল করিলে, চাল হইতে প্রস্তুত হইল সেই নানাবিধ সুখাদ্য,—ঘৃতে-অন্নে ঘৃতান্ন, দুধে-অন্নে মিষ্টান্ন-পায়সান্ন-পরমান্ন, হরেক রকমের পিঠা সরুচাকলি, তাহার সঙ্গে পঞ্চপুষ্পে ধূপে-দীপে চন্দনে গন্ধে দেবীর পূজা করিয়া রাখাল ও রাজকন্যা দেবীর ভোগ দিয়া সর্বাগ্রে দিলেন কৃষাণকে, রাখালকে—নিজের স্বামীকে, ঘরের জনকে—তাহার পর বিলাইলেন পাড়া-প্রতিবেশীকে, হেলে বলদ, গাই গরু ছাগল ভেড়া—এমন কি বাড়ীর উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরটা পর্যন্ত প্রসাদ পাইল।

লক্ষ্মীদেবী মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিলেন, আপন পরিচয় দিলেন, বর দিলেন, তোমার মতো এই পৌষ-সংক্রান্তিতে যে আমার পূজার্চনা করিবে—তাহার ঘরে আমি অচলা হইয়া বাস করিব। পৃথিবীতে তাহার কোন অভাব বা কোন দুঃখ থাকিবে না, পরলোকে সে করিবে বৈকুণ্ঠে বাস।

[গণদেবতা]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

দিব্যাঙ্গ—স্বর্গীয় শোভাবিশিষ্ট দেহ। সৌরভ—সুগন্ধ। কজ্জল—কাজল। সরুচাকলি—চাল কলাই ইত্যাদির পাতলা পিঠা। উচ্ছিষ্ট—ভুক্তাবশেষ বা এঁটো। বৈকুণ্ঠ—স্বর্গ (বিষ্ণুর পুরী)।

অনুশীলনী

১। "ভগবান্, আর পারি না, এ কষ্ট তুমি দূর কর, আমাকে বাঁচাও।"— এ উক্তিটি কার? কেন সে এরূপ বলেছিল? লক্ষ্মী-নারায়ণের দৃষ্টি কীভাবে তার উপর পড়ল?

২। "নারায়ণের অনুমতি লইয়া লক্ষ্মী আসিলেন মর্ত্যে।"—অনুমতি-প্রদানের পূর্ব-সূত্র বর্ণনা কর। লক্ষ্মী মর্ত্যে আসবার পর কী ঘটল? রাখালকে তিনি কী বললেন?

৩। রাখাল লক্ষ্মীকে প্রণাম করার পর থেকে রাখালের চাষ-বাস সম্বন্ধে কী জানো? রাজার সঙ্গে রাখালের যোগাযোগের কথা বলো।

৪। পৌষ-সংক্রান্তিতে রাখাল কর্তৃক লক্ষ্মীদেবীর পূজার বর্ণনা দাও। লক্ষ্মী রাখালকে কী বর দিলেন?

৫। 'পৌষলক্ষ্মী' কাহিনীটি পড়ে স্বদেশের কৃষি ও আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তোমার যে ধারণা জন্মে, সংক্ষেপে তা প্রকাশ কর।

৬। প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) সেই গাছের বর্ণ…ঘরে তুলিবে। (খ) সেই ঠাকরুণ…বসিয়া আছেন।

৭। অর্থ বলো :

দিব্যাঙ্গ, সৌরভ, কজ্জল, উচ্ছিষ্টভোজী, বৈকুণ্ঠ।

৮। নিম্নোক্ত পদগুলির সমাস বলো ও ব্যাসবাক্য লিখ :

দুঃখ-কষ্ট, উধ্বর্মুখ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, আকাশ-পথ, মা-লক্ষ্মী, দিব্যাঙ্গ, গাত্র-গন্ধ, জলপূর্ণ, ঘৃতান্ন, উচ্ছিষ্টভোজী, পূজার্চনা।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :

(ক) 'পৌষলক্ষ্মী' রচনাটির কোন্ কোন্ অংশ তোমার কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়?

(খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কোন একটি ছোটগল্পের নাম বলো।

[বনফুল (১৮৯৯—১৯৭৯ খ্রীঃ) এ-যুগের একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী। ছোটগল্প উপন্যাস নাটক ইত্যাদি রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। ছোটগল্প রচনাতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা অসাধারণ। অতি অল্প কথায় তিনি গল্পরস জমিয়ে তোলেন এবং সেই সঙ্গে গভীর জীবন-রহস্যেরও সন্ধান দেন। বৃহত্তর মানবধর্মের তিনি পূজারী। এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় উদ্ধৃত গল্পটিতেও মিলবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় এ-গল্পটি লেখা। পাক-সৈন্যরা ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। লুঠতরাজ আর নির্বিচার হত্যা চালিয়ে বাংলাদেশ (তখনকার পূর্ব-পাকিস্তান) ছারখার করছে। এই যখন দেশের অবস্থা তখন একটি লোক তার একমাত্র সম্বল একটি গাইকে নিয়ে কীভাবে ভারতে পালিয়ে এল এবং শেষ পর্যন্ত কী ঘটল তার ভাগ্যে, এ-গল্পে তাই বলা হয়েছে।]

পাক-সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে আগুন দিয়ে গ্রামের লোকদের নির্বিচারে হত্যা করছে, এ-খবর যখন এসে পৌঁছল তখন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। গ্রামের সবাই যে যেদিকে সুবিধা পেল সরে পড়ল। গ্রামের চেয়ে প্রাণের প্রতি মায়া তাদের বেশী। যেমন ক'রে হোক প্রাণটা বাঁচাতে হবে। একলা পড়ে গেল শেষকালে সে। কী করবে? সে-ও পালিয়ে যাবে? গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে না;

বাইরের জগতের সঙ্গে তার পরিচয়ও নেই। কোথায় যাবে? গ্রামের বাইরে সে যায় নি কখনও। মাঝে মাঝে তুলসীহাটা গ্রামে গিয়েছে বাজার করতে। তুলসীহাটার হাট থেকে বুধি গাইটি কিনে এনেছিল। বুধি পোয়াতি হয়েছে, এইবার তার বাচ্চা হবে কয়েক দিন পরে। বুধি গাই আর বিঘে দুই জমি ছাড়া আর তার কিছু নেই। বউ অনেক দিন আগে মরেছে। একটা মেয়ে হয়েছিল, সে-ও বাঁচে নি। তার সংসারে বুধি ছাড়া আর কেউ নেই। বুধি আসন্ন-প্রসবা। তাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে কোথায় যাবে সে? কিন্তু একদিন যেতেই হ'ল। তুলসীহাটারই একজন লোক এসে বললে—আমরা সব পালাচ্ছি। তুমিও পালাও। পাক-সেনারা এসে প্রথমেই তোমার গরুটা কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলবে। ওরা যেখানেই যাচ্ছে গরু মোষ ভেড়া ছাগল মুর্গি হাঁস সব সাফ ক'রে দিচ্ছে। তারপর তোমাকে গুলি করবে। আর দেরি কোরো না। পালাও!

বুধিকে কেটে খেয়ে ফেলবে? সে কি! একথা যে ভাবাও যায় না।

দু'দিন ক্রমাগত হেঁটে অবশেষে একটা নদীর তীরে উপস্থিত হ'ল সে। খরস্রোতা নদী। যে পথ দিয়ে সবাই আসছিল সে পথ দিয়ে আসে নি সে। সে মাঝামাঝি সোজা এসেছে। লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে এসেছে। তার সর্বদা ভয় তার বুধিকে যদি কেউ কেড়ে নেয়! পাক-সেনারা হঠাৎ যদি এসে পড়ে পথ দিয়ে! পথ দিয়ে তাই যায় নি সে। লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝামাঝি এসেছিল।

নদীতে নৌকা নেই। ঘাটও নেই। তবু বুধিকে নিয়ে নদীতেই নেমে পড়ল সে। সাঁতরে পার হবে। ভীষণ স্রোত। স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল সে। বুধিও সাঁতার কাটছিল, কিন্তু সে-ও ভেসে যাচ্ছিল স্রোতের টানে। অন্যদিকে ভেসে যাচ্ছিল। তাদের

দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমশঃ। অবশেষে সে যখন ওপারে উঠল বুধিকে দেখতে পেল না। সূর্য অস্ত গেছে অনেকক্ষণ। চারিদিকে অন্ধকার নামছে। বুধিকে আর দেখতে পেল না সে। নদীর তীরে একটা গাছতলাতে বসেই কাটিয়ে দিলে সে সমস্ত রাত। সকাল হ'ল। কিন্তু বুধি কই? বুধি তো এলো না। তখন সে হাঁটতে আরম্ভ করল। প্রশস্ত একটা মাঠ পেরিয়ে একটা গ্রামের ভিতর ঢুকল। বেশ বড় গ্রাম। পাকিস্তান, না হিন্দুস্থান? কে জানে? গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। সবাই অচেনা।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটা ঘরের সামনে তার বুধিকে বেঁধে রেখেছে। বুধির বাচ্চা হয়েছে একটা। বুধি তাকে দেখে ডেকে উঠল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল তার দিকে। একজন বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলে—'তুমি কে হে?'

'আমি পাকিস্তান থেকে এসেছি।'

'এখানে কি চাও?'

'কিছু চাই না। ওই গাইটা আমার।'

'তোমার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার যে তার প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ? প্রমাণ কি করে দেব?'

'তাহলে যাও।'

সে দাঁড়িয়ে রইল তবু। 'আমাকে এখানে থাকতে দিন দয়া করে।'

'তুমি হিন্দু, না মুসলমান?'

সে থতমত খেয়ে গেল। হিন্দু মুসলমান কি বললে সুবিধে হবে তা তার মাথায় এল না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি হিন্দু, না মুসলমান?'

তবু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। আর একজন বেরিয়ে এসে বলল—পাকিস্তানী চর মনে হচ্ছে। ধরে থানায় দিয়ে এস।

ভয় হ'ল তার। ছুটতে লাগল সে। প্রাণপণে ছুটতে লাগল। হাম্বা-হাম্বা ডাক শুনে পিছু ফিরে দেখল দড়ি, ছিঁড়ে বুধিও তার পিছু পিছু আসছে। তার পিছনে টলতে টলতে আসছে বাছুরটা।

সে হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন বুধির মনে কখনও জাগে নি।

[শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৭৮]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

নির্বিচারে—বিনা বিচারে।
পোয়াতি—সন্তানসম্ভবা।
সাফ ক'রে দিচ্ছে—মেরে ফেলছে।
চর—গোয়েন্দা।

অনুশীলনী

১। "কী করবে? সে-ও পালিয়ে যাবে?"—পালাবার প্রশ্ন কেন উঠল? এ-ব্যাপারে 'সে' কি কোনো দ্বিধায় পড়েছিল? যদি পড়ে থাকে তো কেন?

২। "তার সংসারে বুধি ছাড়া আর কেউ নেই।"—কী ধরনের সংসারকে উপলক্ষ করে এই উক্তি? বুধিকে নিয়ে 'সে' পালাতে বাধ্য হল কেন?

৩। গ্রামের পথে 'সে' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? সেখানে 'সে' কী করে এল? নতুন গ্রামে এসে কী অভিজ্ঞতা হল তার?

৪। "সে হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন বুধির মনে কখনও জাগে নি।"—কোথায়, কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য? কাহিনী-সূত্র উল্লেখ করে বুঝিয়ে দাও।

৫। গল্পটি পড়ে মানব-চরিত্রের সংকীর্ণতা সম্বন্ধে তোমার ধারণা বলো।

৬। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) গ্রামের…তাদের বেশী। (খ) সে…জাগে নি।

৭। 'বুধি' গল্পটি থেকে এমন পাঁচটি বাক্য খুঁজে বের কর যেখানে সাধারণ মানুষের দুঃখ ও বেদনার কথা আছে।

৮। প্রশ্নাবলী (মৌখিক): (ক) 'বুধি' ছাড়া জন্তু-জানোয়ারকে ভিত্তি করে লেখা অন্য একটি গল্পের নাম বলো। (খ) 'বুধি'র মালিককে আগা-গোড়া 'সে' বলা হয়েছে কেন? তার কিছু একটা নাম দিলে কী ক্ষতি হ'ত?

চিল্কা
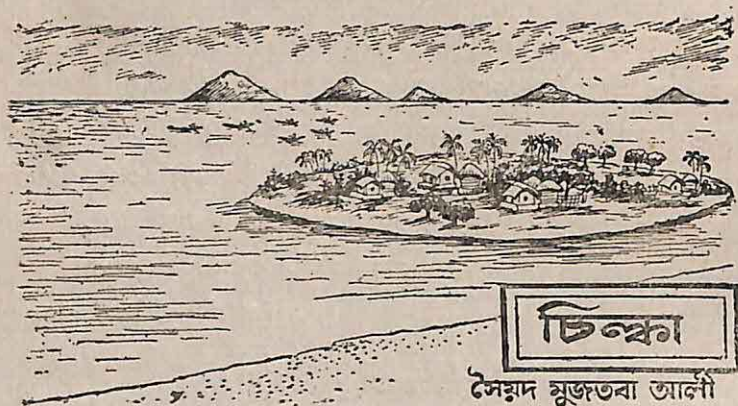
সৈয়দ মুজতবা আলী

[চিল্কা হ্রদ ভারতের পূর্ব-উপকূলে, ওড়িশা রাজ্যে। পুরী ও গঞ্জাম জেলার মধ্যে হ্রদটির অবস্থান। হ্রদটির দৈর্ঘ্য ৭০ কিলোমিটার, প্রস্থ প্রায় ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত। পুরী থেকে সহজেই ওখানে যাওয়া যায়। এছাড়া, কলকাতা-মাদ্রাজ রেললাইন চিল্কার তীর-ঘেঁষে গিয়েছে।

সুপণ্ডিত ও রসিক লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪—১৯৭৪ খ্রীঃ) দেশ-বিদেশে ঘুরে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এখানে তিনি চিল্কা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এ-লেখাটি হল লেখকের 'ধূপছায়া' (১৩৬৪) নামক গ্রন্থের 'চিল্কা' শীর্ষক রচনার অংশবিশেষ।]

চিল্কা হ্রদ বিস্তর ছোট ছোট দ্বীপে ভর্তি। মাত্র একটি ছাড়া নাকি সব কটাতেই মিষ্টি জল পাওয়া যায়। এসব দ্বীপে থাকে গরীব জেলেরা। ডাঙার সঙ্গে এদের কোনো যোগসূত্র নেই। এদের পোস্টাফিস নেই, টেলিগ্রাফের তার ডাঙার সঙ্গে দ্বীপের মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয়নি। আর আপন দ্বীপের বাইরে বিশ্বসংসারের কাকেই বা এরা চেনে যে ওরা এদের টেলিগ্রাম পাঠাবে, ওরা এদের কুশল-সংবাদ জানতে চাইবে।

আমি ভাবলুম, আমার দেশে নাগা, গারোরা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে, কিম্বা বাসে করে শহরে যায়।

এটা সেটা দেখে, ফুটপাথের দোকানে বসে চা খায়, সিনেমা যায়, কেনাকাটাও করে। এই উড়িষ্যারই আদিবাসীরা মাঝে মাঝে বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বাড়িঘরদোর দেখে, হয়ত মনে মনে সংকল্প করে, বনের ভিতরই ওদের জীবনকে আরো সমৃদ্ধ করবে। কিন্তু চিল্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী। আজ যে-সব জিনিসপত্র দিয়ে তারা মাছ ধরে, দু' হাজার বৎসর পূর্বেও তাই দিয়ে তারা মাছ ধরেছে। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি, বিজ্ঞানের প্রসার এদের কোন কাজে লাগেনি।

হয়ত ভালোই আছে। ফার্সীতে বলে, 'দূর বাশ্, খুশ বাশ্।' দূরে আছে, ভালোই আছে। টমাস কেম্পিসও বলেছেন, 'যতবার আমি মানবসমাজে গিয়েছি ততবারই আমি খানিকটে মনুষ্যত্ব হারিয়ে বাড়ি ফিরেছি।' হয়ত 'সভ্যতা'র আওতায় না এসে এরা সত্যই সভ্যতর।

চিল্কার বড় দ্বীপ পারিকুদ। ডাঙা থেকে মাইল আষ্টেক দূরে হবে। দ্বীপে নেমে খানিকক্ষণ চলার পর মনে হল, কোথায় চিল্কা, কোথায় তার নীলুফরি জল, কোথায় দূর দূরান্তের সিন্ধুরেখা আর কোথায়ই বা কৃষ্ণপক্ষ পক্ষীর শুভ্র বক্ষের মল্লিকা বর্ষণ। এ তো দেখছি, পুব বাঙলার পাড়া গাঁ। রাস্তার উপর সাদা ধুলো। দু'দিকে রাস্তার জন্য মাটি তোলার ফলে লাইন বেঁধে ডোবার সারি। তাতে ফুটেছে ছোট ছোট শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম। মাছরাঙা ওড়াওড়ি করছে আর মাঝে মাঝে একপায়ে দাঁড়িয়ে ধ্যানমগ্ন বক। মোষগুলো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে চোখ বন্ধ করে মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে। শুধু পুব বাঙলার জমির মত এ-জমি উর্বরা নয়; তাই ক্ষেত-খামারের চিহ্ন কম।

রোদ চড়ছে। দূর গ্রামের শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়োয়। ঐখানে পৌঁছতে পারলে হয়। শহরের লোক; এতখানি হেঁটে অভ্যেস নেই। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।...

সূর্য মধ্যগগনে। লঞ্চ পুবদিকে সমুদ্রের পানে ধাওয়া করেছে, যেখানে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গম।

পূর্ব দিগন্তে যেখানে সমুদ্র আর হ্রদ আকাশের সঙ্গে মিশেছে সে জায়গা ঝাপসা হয়ে আছে। মনে হয়, হ্রদ দূরে যেতে যেতে হঠাৎ যেন কোথাও অসীম শূন্যে লীন হয়ে গিয়েছে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে গরমের দেশের দগ্ধতাম্র দিগন্তে যে আস্বচ্ছ ছায়ানৃত্য আরম্ভ হয়, এখানে যেন তারই এক অন্যরূপ। এখানে যেন অশরীরী বাষ্প-নৃত্য আরম্ভ হয়েছে আর তারই আড়ালে হ্রদের শেষ, সমুদ্রের আরম্ভ, সমুদ্রবক্ষে আকাশের চুম্বন সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

তাই পশ্চিমমুখো হয়ে বসলুম ডাঙার দিকে তাকিয়ে।

পাখীরা সব গেল কোথায়? শুধু দু'একটি ঝাঁক হেথা হোথায়। বোধ হয় ঠাণ্ডা দেশের প্রাণী বলে দ্বীপের গাছতলায় ঠাণ্ডাতে আশ্রয় নিয়েছে।

কত রকমের নীল রঙ দেখছি।

হ্রদের জল দুপুর রোদে অতি হাল্কা ফিকে নীল হয়ে গিয়েছে। হ্রদের পরে পাড়ের গ্রামের রঙ এমনিতে ঘন সবুজ, কিন্তু এখন দেখাচ্ছে হ্রদের জলের চেয়ে একটুখানি ঘনতর নীল। গ্রামের পিছনে পাহাড়, তার রঙ আরো একটু বেশী ঘন নীল। এবং সর্বশেষে পাহাড়ের পিছনের আকাশ ঘোর নীল।

এ কি করে সম্ভব হয় জানিনে। গ্রামের গাছপালা, পাহাড়ের ঝোপঝাড় হয় সবুজ রঙের, কিন্তু আজ এরা নীলের ছোপ মেখে নিল কি করে? তবে কি আমার আর পাড়ের মাঝখানে দীর্ঘ নীল বিস্তৃতি আমার চোখ দু'টিকে নীলাঞ্জন—কিম্বা নীল চশমা—পরিয়ে দিয়েছে যে, আমি সব কিছুই নীল দেখছি?

[ধূপছায়া]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা টিপ্পনী ॥

নাগা—মণিপুরের উত্তরপ্রান্তে এবং আসামের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে নাগাদের বাসস্থান। 'নাগা' শব্দ 'নগ্ন' বা 'নাগ' থেকে এসেছে কিনা, সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে একসময় ঘৃণা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হ'ত। নাগাদের অধিকাংশ গ্রামই পাহাড়ের চূড়ায়, কুটিরগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নানাভাবে সুরক্ষিত।

গারো—আসামের আদিবাসী। গারো-পাহাড় অঞ্চল এদের প্রধান বাসভূমি। গারোরা নিজেদের আচিক বা মান্দে বলে থাকে। আচিক শব্দের অর্থ পাহাড়ী মানুষ।

টমাস কেম্পিস (১৩৮০—১৪৭১ খ্রীঃ)—জার্মান দার্শনিক ও সাধক। খ্রীষ্টান ধর্ম ও ভজনালয় সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা।

সিন্ধুরেখা—সমুদ্রসীমা। নীলাঞ্জন—রসাঞ্জন।

অনুশীলনী

১। চিল্কা হ্রদ কী ধরনের? সেখানে কারা থাকে? তাদের জীবন-যাত্রা কী প্রকার?

২। "কিন্তু চিল্কার দ্বীপবাসীরা সৃষ্টির সেই আদিমকাল থেকেই দ্বীপবাসী।"—লেখক কী কারণে এই মন্তব্য করেছেন, বলো। দ্বীপবাসীদের বিচ্ছিন্ন জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিমত কী?

৩। পারিকুদ দ্বীপ কোথায়? দ্বীপটির পরিচয় দাও।

৪। গ্রীষ্মের দুপুরে চিল্কার প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা কর।

৫। নিজের ভাষায় চিল্কা হ্রদের একটি বর্ণনা দাও।

৬। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) হয়ত···সত্যই সভ্যতর! (খ) এ তো দেখছি,···পাড়া গাঁ। (গ) মনে হয়,···গিয়েছে। (ঘ) গ্রীষ্মের· ···এক অন্যরূপ। (ঙ) এখানে যেন······পড়ে গিয়েছে।

৭। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :

(ক) হ্রদের সঙ্গে নদীর সৌন্দর্যের পার্থক্য কোথায় ?

(খ) ভ্রমণ-কাহিনী বলতে কী ধরনের রচনা বোঝায় ? 'চিল্কা' রচনাটি কোন্ পর্যায়ের ?

পদ্যাংশ

দণ্ডকারণ্য

কৃত্তিবাস ওঝা

[কৃত্তিবাস ওঝা বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিদের অন্যতম। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের ভাবানুবাদ করেন। উদ্ধৃত কাব্যাংশটি সাত কাণ্ডে বিভক্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডের অন্তর্গত। এখানে দেখা যাচ্ছে, লক্ষ্মণ ও সীতা-সহ বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রকে। ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করতে লাগলেন। তারপর ওঁরা যাত্রা করলেন দণ্ডকারণ্য অভিমুখে। উদ্ধৃত কাব্যাংশটিতে দণ্ডকারণ্যের শোভা বর্ণিত।]

মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি ॥
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ।
জনকতনয়া মধ্যে অপূর্ব শোভন ॥
ফল পুষ্পে দেখেন সুগন্ধে আমোদিত।
ময়ূরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥
নানা পক্ষিকলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর ॥

বনমধ্যে আছে বহু মুনির বসতি।
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করি স্তুতি॥
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান।
যথা তথা থাক রাম তুমি ভগবান॥
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ॥
দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন।
তিন জন মনসুখে করেন ভ্রমণ॥
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
নানা স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ॥

[কৃত্তিবাসী রামায়ণ : আরণ্যকাণ্ড]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

দণ্ডকারণ্য—দক্ষিণ ও মধ্যভারতের বিশাল অরণ্য অঞ্চল। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ; ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র—এই চারটি রাজ্য জুড়ে এর অবস্থান।
রঘুনাথ—রামচন্দ্র (রঘু নামক রাজার বংশজাত)।
জনকতনয়া—জনক রাজার কন্যা, সীতা। কমল—পদ্ম।

অনুশীলনী

১। শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্য অভিমুখে কীভাবে গেলেন? দণ্ডকারণ্যে তিনি কী দেখলেন? কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন?

২। কৃত্তিবাস ওঝাকে অনুসরণ করে দণ্ডকারণ্যের রূপ ও শোভা বর্ণনা কর।

৩। 'দণ্ডকারণ্য' কবিতাটি পাঠ করে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়? এই কবিতার কোন্ কোন্ অংশে তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?

৪। "বনমধ্যে আছে বহু মুনির বসতি।"—এখানে কোন্ বনের কথা বলা হয়েছে? বনটির পরিচয় দিয়ে মুনিদের সম্পর্কে যা জান, বলো।

৫। ব্যাখ্যা লিখ:

রাজ্যে থাক……সমান।

৬। অর্থ বলো:

জনকতনয়া, আমোদিত, কেকাধ্বনি, নিরীক্ষণ।

৭। এই কবিতা থেকে এমন দু'টি শব্দ খুঁজে বের কর যাদের ব্যবহার শুধু মাত্র কবিতাতেই সম্ভব।

৮। নিম্নোক্ত পদগুলির সমাস বলো ও ব্যাসবাক্য লিখ:

জনকতনয়া, কেকাধ্বনি, পক্ষিকলরব, মনস্থখ।

৯। নিম্নোক্ত বাক্যটির কোন্‌টি কী পদ বলো। 'মুনির' ও 'চরণে' এই দু'টি শব্দের কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর:

মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি।

১০। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) 'দণ্ডকারণ্য' কবিতাটি কোন্ কাব্যের অন্তর্গত? এই কাব্যের আদি কবি কে?

(খ) রামায়ণ মোট ক'টি কাণ্ডে বিভক্ত? কাণ্ডগুলির নাম বলো।

ধরনের প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে?—মূল কবিতা অনুসরণ করে বুঝিয়ে দাও।

৪। কলিঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সময় সেখানকার মানুষ, জন্তু ও প্রকৃতির মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, আলাদা আলাদাভাবে বুঝিয়ে দাও।

৫। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) নিমিষেকে……জল। (খ) চারি মেঘে……বাজ। (গ) করিকর…হারা। (ঘ) পরিচ্ছন্ন…জনক জননী।

৬। অর্থ বলো:

তনু, চিকুর, রড়, চারি ভিত, করিকর, মহী, ভুজঙ্গম।

৭। এই কবিতার মধ্য থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ ও সন্ধিবদ্ধ পদগুলি খুঁজে বের কর।

৮। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) কলিঙ্গদেশ বলতে এখানে কী বোঝান হয়েছে?

(খ) 'কবিকংকণ'—এই শব্দটি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নামের আগে ব্যবহৃত হয় কেন?

[বিখ্যাত সাংবাদিক ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯ খ্রীঃ) বাংলা কবিতায় নতুন রীতি প্রবর্তন করেন। ভারতচন্দ্রের প্রভাব যখন ক্ষীণ হয়ে এল তখন তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ছোট ছোট কবিতা রচনা করতে লাগলেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গই ছিল তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সমসাময়িক কবি।]

মহৎ যে হয় তার সাধু-ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ॥
কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই মানে সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই॥

শারী আর শুকপাখী অনেকেই রাখে।
যত্ন করে কে কোথায় কাক পুষে থাকে ?
অধমে রতন পেলে কি হইবে ফল ?
উপদেশে কখনো কি সাধু হয় খল ?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগরে ॥
লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে সুধা বরিষণ ॥
সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া ॥

[রস-লহরী : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

সুবাস—সুগন্ধ। অখিল—যাবতীয়, নিখিল, বিশ্বজগৎ। ঠাঁই—স্থান।
শুক—টিয়াজাতীয় পাখী। ভুজঙ্গ—সাপ। গরল—বিষ।
উগরে—বর্ষণ করে, ঢালে। জলধি—সমুদ্র। জলধর—মেঘ।
সুধা—অমৃত।

অনুশীলনী

১। খল ও নিন্দুকের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?—পাঠ্য কবিতাটির মর্মার্থ উদ্ধার করে বুঝিয়ে দাও।

২। মহতের বৈশিষ্ট্য কী ? চন্দনের সঙ্গে তার যোগ কোথায় ? কাক অথবা কোকিল,—কার সঙ্গে তার সাদৃশ্য ? সমাজে শারী ও শুকপাখীর আদর কেন ?

৩। কাক ও ভুজঙ্গের প্রকৃতি কী ? চন্দন ও জলধরের প্রকৃতির সঙ্গে এদের পার্থক্য কোথায় ?

৪। গুণবান ও গুণহীনের পার্থক্য বোঝাতে এই কবিতায় যে ক'টি উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তাদের পরিচয় দাও। কোন্ উপমাটি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ?

৫। কবিতাটির প্রথম আট পঙ্ক্তি মুখস্থ লিখ।

৬। অর্থ বলো :

সুবাস, অখিল, ভুজঙ্গ, লবণ-জলধি, জলধর।

৭। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) দেখহ……কুঠার করে বিতরণ। (খ) শারী……পুষে থাকে ? (গ) ভাল, মন্দ……গরল উগরে। (ঘ) লবণ-জলধি-জল……বরিষণ। (ঙ) সুজনে… ··নাশিয়া।

৮। এই কবিতাটি থেকে তিনটি বিশেষ্য, তিনটি বিশেষণ ও পাঁচটি ক্রিয়াপদ খুঁজে বের কর।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :

(ক) 'খল ও নিন্দুক' কবিতার বক্তব্যের সঙ্গে তুমি কি একমত ? এ-সম্পর্কে তোমার ধারণা বুঝিয়ে বলো।

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোন্ সময়কার কবি ? তাঁর সমসাময়িক যে-কোন একজন কবির নাম বলো।
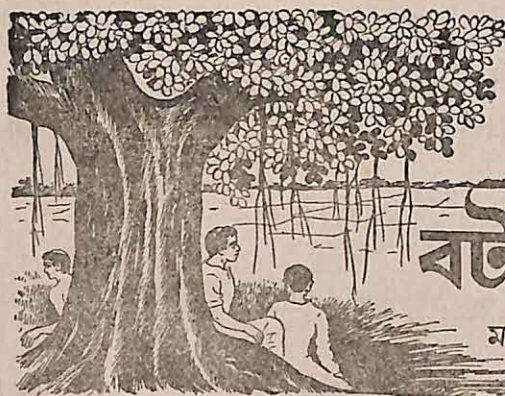
[বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রীঃ) 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) রচনা করে বাংলাসাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। এছাড়া নাটক ও সনেট রচনা করেও মাতৃভাষাকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। সনেট হল "বিশেষ ধরনের গঠন ও মিল-সংযুক্ত এবং চতুর্দশ পঙক্তিতে সম্পূর্ণ কবিতা।" ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে থাকবার সময় মধুসূদন বহু সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। এই সব কবিতায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং কবির ব্যক্তিগত ভালো-লাগা বা মন্দ-লাগার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে।]

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি।
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,

পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে ;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে !
দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

তরুরাজ—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। প্রত্যক্ষতঃ—দৃশ্যতঃ, সাক্ষাৎভাবে। বিধি—এখানে বিধাতা অর্থে। হিতৈষিণী—কল্যাণসাধিকা। দুহিতা—কন্যা। বসুধা—পৃথিবী। দগধে—দহন করে। সতত—সর্বদা পরিহরি—পরিত্যাগ করিয়া। মিহির—সূর্য। সদন—গৃহ, আলয়। খেচর—পক্ষী। বিরাজে—অবস্থান করে। ভুঞ্জি—(ভুঞ্জিত) ভুক্ত। পদ্মরাগ—রক্তবর্ণ মণি (এখানে রক্তবর্ণ মণিতুল্য ফল অর্থে)।

অনুশীলনী

১। "দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।"—কাকে উদ্দেশ্য করে কে কোথায় এই মন্তব্য করেছেন ? এ-মন্তব্যের পেছনে যুক্তি কী ?

২। 'বটবৃক্ষ' কবিতার মর্মকথা নিজের ভাষায় প্রকাশ কর। কবিতাটির অভিনবত্ব কোন্‌খানে ?

৩। (ক) বটবৃক্ষকে কবি কী কী নামে সম্বোধন করেছেন ? কোন্ কোন্ সৎকাজের জন্য তাকে দায়ী করেছেন ? (খ) কবিতাটি মুখস্থ লিখ।

৪। ব্যাখ্যা লিখ : (ক) নাহি চাহে তরুরাজ ! (খ) প্রত্যক্ষতঃ…ধরি ! (গ) দেব নহ…মত।

৫। অর্থ বলো : হিতৈষিণী, দুহিতা, বসুধা, মিহির, সদন, খেচর, ভুঞ্জি।

৬। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) : (ক) 'বটবৃক্ষ' ছাড়া মধুসূদনের যে-কোনো দু'টি কবিতার নাম বলো। (খ) চতুর্দশপদী কবিতা বলতে কী বুঝায় ?

[স্মরণীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-৯৪ খ্রীঃ) উনবিংশ শতকের বাংলা কবিতায় নতুন প্রাণসঞ্চার করেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্য-কবিতায় কবির নিজস্ব অনুভূতির অতি সুন্দর পরিচয় রয়েছে। সেকালের কৃত্রিম কাব্য-রচনার যুগে বিহারীলালের কবিতায় 'কবির নিজের কথা'র পরিচয় ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের 'ভোরের পাখি' বলেছেন। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম 'সঙ্গীত-শতক' (১৮৬২ খ্রীঃ) ও 'সারদামঙ্গল' (১৮৭৯ খ্রীঃ)।]

মানুষ আমার ভাই
বড় প্রিয়ধন,
মানুষ-মঙ্গল সদা
করি আকিঞ্চন ;

জন্মেছি মানুষ-অঙ্গে
বেড়েছি মানুষ-সঙ্গে,
মানুষের সমুখেই
হইবে মরণ ;

মানুষেরি খাই, পরি,
মানুষেরি কর্ম করি,
মানুষেরি তরে ধোরে
রয়েছে জীবন ;

মানুষের ব্যবহারে
জ্বালায়েছে বারে বারে,
চোটে গিয়ে নির্জনেতে
করেছি গমন,—

সেখানে প্রকৃতি এসে
সমুখে দাঁড়ায়ে হেসে
প্রেম-ভরে দিয়েছেন
গাঢ় আলিঙ্গন,—

তাঁর প্রেমে মগ্ন হয়ে,
দ্রবীভূত প্রায় রয়ে,
করি বটে কিছুদিন
আনন্দে যাপন,—

পরে ভাল নাহি লাগে,
কেবলই মনে জাগে
প্রিয়তম মানুষের
মোহন আনন।

[সঙ্গীত-শতক : বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ ;
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৪২)]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

আকিঞ্চন—এখানে আকাঙ্ক্ষা অর্থে। আনন—মুখ
দ্রবীভূত—এখানে মিলেমিশে একাত্ম হওয়া অর্থে। মোহন—মনোহর, চিত্তাকর্ষক।

অনুশীলনী

১। কবি 'মানুষের গান' করেন কেন? কেন তিনি নির্জনে থাকতে পারলেন না?

২। কবি হঠাৎ কেন 'নির্জনেতে' গেলেন? সেখানে গিয়ে তাঁর কী অভিজ্ঞতা হ'ল?

৩। মানুষের কাছে কবি কৃতজ্ঞ কেন? কেন মানুষ তাঁর কাছে 'প্রিয়তম'?

৪। 'মানুষের গান' কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৫। কবিতাটির প্রথম বারো পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

৬। প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক ব্যাখ্যা কর:

(ক) জন্মেছি মানুষ-অঙ্গে···হইবে মরণ। (খ) পরে ভাল···মোহন আনন।

৭। অর্থ বলো: আকিঞ্চন, দ্রবীভূত, আনন।

৮। উদ্ধৃত কবিতাটির প্রথম তিনটি স্তবককে গদ্যে রূপান্তরিত কর।

৯। সংকলিত কবিতাটি থেকে তিনটি বিশেষ্য, দু'টি বিশেষণ ও চারটি ক্রিয়াপদ খুঁজে বের কর।

১০। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) 'মানুষের গান' কবিতাটির মধ্য দিয়ে কবি-মনের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

(খ) তোমার কী ভালো লাগে? মানুষের গান, না প্রকৃতির গান? বিহারীলাল-এর অনুসরণে জবাব দাও।

(গ) বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' বলা হয়েছিল কেন?

[বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ খ্রীঃ) 'বৃত্রসংহার' কাব্য লিখে অমর হয়ে আছেন। তাঁর কবি-ভাবনার বৈশিষ্ট্য মানবপ্রেম ও স্বদেশপ্রীতি। 'কবিতাবলী' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। রসসৃষ্টি ও মাধুর্যের দিক দিয়ে 'কবিতাবলী'র খণ্ড খণ্ড কবিতাগুলি আজও আমাদের মুগ্ধ করে। 'পদ্মের মৃণাল' কবিতাটি 'কবিতাবলী' থেকে উদ্ধৃত।]

(১)

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে ;
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
একদৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

(২)

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মন,
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি ?
রাজা রাজমন্ত্রিলীলা বলবীর্য স্রোতঃশিলা
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?
এই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি !
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহিক নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী ?
লতা পশু কীট সম মানবেরো পরাক্রম
জ্ঞান বুদ্ধি যত্ন-বলে বাঁধা কি সকলি ?
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি ?

[সংক্ষেপিত]

[কবিতাবলী (নানা বিষয়ে) :
হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী]

॥ **শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী** ॥

পদ্মের মৃণাল—পদ্মের নাল বা ডাঁটা
স্বচ্ছ—অতি নির্মল।
উথলি—উথলানো, উপচানো, ছাপিয়ে পড়া।
হিল্লোল—তরঙ্গ, দোলন।
কায়—কায়া, দেহ, শরীর।
নিবন্ধন—কারণ, হেতু।

অনুশীলনী

১। সরোবরে কবি কী দেখলেন ? দেখতে দেখতে তাঁর শোক উপস্থিত হ'ল কেন ?

২। "অই মৃণালের মত হায় কি সকলি ?"—কবির এই জিজ্ঞাসার কারণ কী ?—'পদ্মের মৃণাল' কবিতা অনুসরণ করে বুঝিয়ে দাও।

৩। "সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;"—কোথায় কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি ? প্রসঙ্গ নির্দেশ করে কবির 'চিন্তার' কথা বুঝিয়ে দাও।

৪। 'পদ্মের মৃণাল' কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৫। কবিতাটির প্রথম স্তবক মুখস্থ লিখ।

৬। প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক ব্যাখ্যা কর :

(ক) সহসা চিন্তার বেগ…সকলি ? (খ) রাজা রাজমন্ত্রিলীলা… নিস্তেজ সকলি ! (গ) লতা পশু…হয় কি সকলি ?

৭। অর্থ বলো :

হিল্লোল, স্বচ্ছ, শতদল, নিবন্ধন।

৮। সংকলিত কবিতাটি থেকে অন্ততঃ তিনটি সমাসবদ্ধ পদ খুঁজে বের কর, তাদের সমাস বলো এবং ব্যাসবাক্য লিখ।

৯। প্রশ্ন (মৌখিক) :

'পদ্মের মৃণাল' কবিতাটির বক্তব্যের সঙ্গে তুমি একমত কিনা বুঝিয়ে বলো।

[নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রীঃ) বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি। 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫ খ্রীঃ) কাব্যটি রচনা করে তিনি কবি হিসেবে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'রৈবতক' (১৮৮৭ খ্রীঃ), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩ খ্রীঃ) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬ খ্রীঃ)—এই কাব্যত্রয় তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। এই তিনটি কাব্য শ্রীকৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্তলীলার কাহিনী। সংকলিত কাব্যাংশটি 'রৈবতক' থেকে উদ্ধৃত। এখানে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসাশ্রমের সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন।]

অর্জুন। আশ্রমের কি মাহাত্ম্য দেখ, বাসুদেব !
কুরঙ্গ, শশক, মেষ, অজ, নীল গাভী,
চরিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়হৃদয়।
নির্ভয়হৃদয়ে দেখ চরিছে কেমন
ময়ূর, কুক্কুট, ঘুঘু, কপোত, শালিক,—
বনচর পক্ষী নানা। কেমন সুন্দর
প্রীতিপূর্ণনেত্রে, দেখ, রয়েছে চাহিয়া
আমাদের মুখ পানে গ্রীবা হেলাইয়া।

কৃষ্ণ। মহর্ষি ব্যাসের ওই "শান্তি-সরোবর"
দেখ পার্থ সম্মুখেতে কিবা মনোহর।

ঋষিশিশুগণ সহ নানা জলচর
খেলিতেছে কি আনন্দে ! ভাই ভগ্নী মত
দেখ শিশুগণ কত করিছে আদর।
শিশুদের উচ্চহাস্য, পক্ষিকলরব,
থাকি থাকি নানাবিধ মীন-আস্ফালন,
সরসী আনন্দপূর্ণ করিছে কেমন !
জলজ কুসুম তুলি, দেখ পরস্পরে
সাজাইছে কি কৌশলে ; সাজিছে কেহ বা ;
কেহ বা গাহিছে শুন কি মধুর স্বরে !
চারি তীরে মনোহর দেখ পুষ্পবন,
পুষ্পবনে পুষ্পময়ী ঋষিকন্যাগণ—
ততোধিক মনোহরা ! বল্কলে আবৃতা,
শোভিছে পল্লবে ঢাকা কুসুমিতা লতা।
কেহ তুলিতেছে ফুল ; গাঁথিছে কেহ বা
চারু ফুলহার ; কেহ আপনার মত
নিরাশ্রয়া বল্লরীরে দিতেছে আশ্রয়।
কেহ পুষ্পবৃক্ষমূলে যোগাইছে জল।
মৃন্ময় কলসী কক্ষে ; কেহ বা কেমন
সরল নয়নে দেখ রয়েছে চাহিয়া
আমাদের মুখ পানে, কি দৃষ্টি শীতল !—
পূর্ণিমা গগন যেন চেয়ে ধরাতল।

[রৈবতক : দ্বিতীয় সর্গ]

॥ **শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী** ॥

বাসুদেব—শ্রীকৃষ্ণ। কুরঙ্গ—হরিণ। কুক্কুট—মোরগ। পার্থ—অর্জুন।

মীন—মাছ। মীন-আস্ফালন—মাছদের সদর্প নড়াচড়া।
সরসী—সরোবর। বল্কল—বাকল, গাছের ছাল। চারু—সুন্দর।
বল্লরী—লতা, মঞ্জরী মৃন্ময়—মৃত্তিকানির্মিত।

অনুশীলনী

১। "আশ্রমের কি মাহাত্ম্য দেখ, বাসুদেব!"—এই উক্তিটি কার? কোন্ আশ্রম প্রসঙ্গে উক্ত? আশ্রমটির সৌন্দর্য বর্ণনা কর।

২। 'শান্তি-সরোবর'-এর বর্ণনা দাও। ঋষিকন্যারা কোথায় ছিলেন? তাঁদের বসন-ভূষণ, ভাব-ভঙ্গি ও ক্রিয়া-কর্মের কথা বলো।

৩। ব্যাসাশ্রমের অভিনবত্ব কোথায়?—মূল কবিতাটি থেকে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে বুঝিয়ে দাও।

৪। 'ব্যাসাশ্রমে কৃষ্ণ ও অর্জুন' কবিতাটির মর্মার্থ নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৫। কবিতাটির শেষ আট পঙ্ক্তি মুখস্থ লিখ।

৬। কোন্‌টি কার উক্তি বলো:

(ক) চরিতেছে স্থানে স্থানে নির্ভয়হৃদয়।

(খ) সরসী আনন্দপূর্ণ করিছে কেমন!

৭। প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) মহর্ষি ব্যাসের…মনোহর। (খ) চারি তীরে…ঋষিকন্যাগণ,—। (গ) কেহ বা…চেয়ে ধরাতল।

৮। অর্থ বলো:

বাসুদেব, কুরঙ্গ, অজ, কুক্কুট, কপোত, জলচর, মীন-আস্ফালন, সরসী, জলজ, বল্কল, বল্লরী, মৃন্ময়।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

মহাভারতের অর্জুন-চরিত্র সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? অর্জুনের চেয়েও মহৎ কোনো চরিত্র মহাভারতে আছে কি? এ-সম্পর্কে তোমার অভিমত বুঝিয়ে বলো।

[সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রীঃ) নানাভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, বিশ্বের দরবারে বাংলাকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটির জন্য ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বলাকা'। গতিই জীবন, চলাতেই মুক্তি ও আনন্দ, এই হ'ল 'বলাকা'র মূল সুর। 'বলাকা' থেকে সংকলিত এই কবিতাটিতে গতিবাদের সেই সুরটি খুঁজে পাওয়া যাবে।]

আমরা চলি সমুখপানে,
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর-গিরি করব রে জয়,
যাব তাদের লঙ্ঘি।
একলা পথে করি নে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপনি মেতে
আছে ওরা গণ্ডি পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, জাগবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃতরস আনব হরে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে। [বলাকা]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

রুদ্র—শিব, শিবের প্রলয়মূর্তি, উগ্র, ভীষণ। ধাঁধা—এখানে দৃষ্টিভ্রম অর্থে।
তূর্য—তূরী, ভারতের প্রাচীন রণবাদ্য বিশেষ, রণশিঙ্গা।
বিষাণ—শৃঙ্গনির্মিত বা শৃঙ্গাকার বাদ্যযন্ত্র। গিরি—পর্বত।
লঙ্ঘি (লঙ্ঘা)—লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা। গণ্ডি—বেষ্টনরেখা, সীমা।
ঈশান—শিব, মহাদেব, উত্তর-পূর্ব কোণ। মথন—মন্থন, আলোড়ন।
দ্বিধা—সংশয়, সন্দেহ, মনের ইতস্ততঃ ভাব। দ্বন্দ্ব—ঝগড়া, বিবাদ।

অনুশীলনী

১। "কাঁদবে ওরা কাঁদবে।"—ওরা বলতে কবি এখানে কাদের কথা বলেছেন? 'সমুখপানে' চলা মানুষদের সঙ্গে ওদের পার্থক্য কোথায়?

২। "রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে বাজিয়ে আপন তূর্য।"—এই উক্তিটি কোন্ শ্রেণীর মানুষের? ওদের জীবনের মূলমন্ত্র কী?

৩। 'আমরা চলি সমুখপানে' কবিতায় কবি কাদের চলার কথা বলেছেন? ওদের চলার পথের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৪। 'গতিই জীবন, চলাতেই আনন্দ'—'আমরা চলি সমুখপানে' মূল কবিতার মর্মার্থ উদ্ধার করে এ-সম্পর্কে বলো।

৫। সমুখপানে এগিয়ে চলা যাত্রীদের এমন কয়েকটি উক্তি মুখস্থ বলো, যেগুলোর মধ্য থেকে তাদের নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) ছিঁড়ব বাধা……ওরা কাঁদবে। (খ) মন ছড়াল……ওরা কাঁদবে। (গ) জাগবে ঈশান……দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

মাটির ডাক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য। গ্রামে-গাঁথা ভারতবর্ষের শান্ত ও নিরুপদ্রব পল্লীজীবন, সেখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ বরাবরই তাঁর কাছে প্রিয়। নাগরিক জীবনের কাঠিন্য ও ঊষরতা বার বার তাঁর কবিপ্রাণকে আঘাত করেছে। 'পূরবী' কাব্য (১৯২৫ খ্রীঃ) থেকে সংকলিত এই কবিতাটিতে সে প্রমাণ মিলবে।]

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণদেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
প্রভাতরবির শঙ্খ বাজে ;
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।

হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা,
আবর্জনা জমে উপার্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরাণ কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলকধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে ;
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

[পূরবী]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

শ্যামল—মেঘবর্ণযুক্ত (এখানে সবুজবর্ণ অর্থে)। নিকেতন—আলয়, গৃহ। অভ্রভেদী—গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ। অঙ্ক—এখানে ক্রোড় বা কোল অর্থে। ইটকাঠের পুরে—শহরাঞ্চলে। জাঁতা—শস্যাদি পিষে গুঁড়ো করবার যন্ত্রবিশেষ।

যন্ত্র-জাঁতা—যন্ত্রের পীড়ন বা নিষ্পেষণ অর্থে।

গোলকধাঁধা—যে বেষ্টনীর মধ্যে ক্রমাগত ঘুরেও বাইরে আসবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। (আসল কথাটি গোরখধাঁধা, অর্থাৎ গোরখনাথ গুরু মীননাথকে উদ্ধার করার জন্য যে-সকল গূঢ় কথা বলেছিলেন)।

অনুশীলনী

১। "আজকে খবর পেলেম খাঁটি"—এখানে কোন্ খবরের কথা বলা হয়েছে, বিশদভাবে বর্ণনা কর।

২। "মা আমার এই শ্যামল মাটি'',—কবির এই স্বীকৃতির পেছনে কী কী যুক্তি আছে, বুঝিয়ে দাও।

৩। "আবর্জনা জমে উপার্জনে।''—কোথায় কোন্ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য ? মূল কবিতার মর্মার্থ অনুসরণ করে বলো।

৪। 'মাটির ডাক' বলতে রবীন্দ্রনাথ কী বোঝাতে চেয়েছেন ? তাঁর মতে, পল্লী-জীবন ও নাগরিক-জীবনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

৫। 'মাটির ডাক' কবিতাটির মর্মকথা নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৬। ব্যাখ্যা লিখ ঃ

(ক) অভ্রভেদী···নিত্য আরাধন। (খ) এইখানে তার···শঙ্খ বাজে।

(গ) তৃপ্তি······উপার্জনে। (ঘ) যন্ত্র-জাঁতায়······নানা সাজে। (ঙ) পথ বেড়ে······মাঝে।

৭। অর্থ বলো ঃ

নিকেতন, অভ্রভেদী, যন্ত্র-জাঁতা, গোলকধাঁধা।

৮। 'মাটির ডাক' থেকে এমন তিনটি শব্দ খুঁজে বের কর, যেগুলোর ব্যবহার শুধুমাত্র কবিতাতেই সম্ভব।

৯। নিম্নোক্ত সমাসবদ্ধ পদগুলির সমাস বলো ও ব্যাসবাক্য লিখ ঃ

অভ্রভেদী, প্রাণদেবতা, অঙ্ক-মাঝে, প্রভাতরবি, সন্ধ্যারতি, ইটকাঠ, বেড়া-ঘেরা, যন্ত্র-জাঁতা।

১০। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) ঃ

(ক) 'মাটির ডাক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কিসের জয়গান করেছেন ? পল্লী-জীবনের ? না নাগরিক-জীবনের ? এ-ব্যাপারে তোমার মত কী ?

(খ) রবীন্দ্রনাথ কোন্ গ্রন্থটি লিখে কবে নোবেল পুরস্কার পান ?

এরা যদি জানে

কামিনী রায়

[কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩ খ্রীঃ) বাংলা সাহিত্যের একজন বরণীয়া মহিলা-কবি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯ খ্রীঃ)। অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নির্মাল্য' (১৮৯১ খ্রীঃ), 'পৌরাণিকী' (১৮৯৭ খ্রীঃ), 'জীবনপথে' (১৯৩০ খ্রীঃ) ইত্যাদি। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি জগত্তারিণী সুবর্ণপদক লাভ করেন।]

এদেরও ত গড়েছেন নিজে ভগবান্,
নবরূপে দিয়েছেন চেতনা ও প্রাণ ;
সুখে দুঃখে হাসে কাঁদে স্নেহে প্রেমে গৃহ বাঁধে
বিঁধে শল্যসম হৃদে ঘৃণা অপমান,
জীবন্ত মানুষ এরা মায়ের সন্তান ॥

এরা যদি আপনারে শিখে সম্মানিতে,
এরা দেশ-ভক্তরূপে জন্মভূমি-হিতে
মরণে মানিবে ধর্ম বাক্য নহে—দিবে কর্ম ;
আলস্য বিলাস আজো ইহাদের চিতে
পারেনি বাঁধিতে বাসা, পথ ভুলাইতে ॥

এরা হতে পারে দ্বিজ—যদি এরা জানে,
এরা কি সভয়ে সরি' রহে ব্যবধানে ?
এরা হতে পারে বীর, এরা দিতে পারে শির
জননীর, ভগিনীর, পত্নীর সম্মানে ;
ভবিষ্যের মঙ্গলের স্বপনে ও ধ্যানে।
যদি এরা জানে ॥

উচ্চ কুলে জন্মে ব'লে কত দিন আর
ভাই বিপ্র রবে তব এই অহঙ্কার ?
কৃতান্ত সে কুলীনের রাখে না তো মান,
তার কাছে দ্বিজ শূদ্র পারীয়া সমান।
তার স্পর্শে যেই দিন পঞ্চভূতে দেহ লীন
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে রহে কত ব্যবধান ?

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

চেতনা—হুঁশ, জ্ঞান, অনুভূতি। শল্য—শেল, কাঁটা। বিপ্র—ব্রাহ্মণ। কৃতান্ত—যম, শমন। দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি। পঞ্চভূত—ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু), ব্যোম (আকাশ)। লীন—লয়প্রাপ্ত, মিলিত।

অনুশীলনী

১। "এদেরও ত গড়েছেন নিজে ভগবান্"—কাদের উপলক্ষ করে কবির এই উক্তি ? কবির মতে, এদের কর্তব্য কী হওয়া উচিত ?

২। 'এরা যদি জানে' কবিতায় কবি কী জানার কথা বুঝিয়েছেন ? কীভাবে তা জানা সম্ভব ?

৩। "ব্রাহ্মণে চণ্ডালে রহে কত ব্যবধান ?"—কবির এই প্রশ্নের পেছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত, সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দাও।

৪। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৫। কবিতাটির প্রথম দশ পঙক্তি মুখস্থ লিখ।

৬। ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) বিঁধে শল্যসম…মায়ের সন্তান। (খ) মরণে মানিবে… ভুলাইতে। (গ) কৃতান্ত…সমান।

৭। অর্থ বলো ঃ

শল্যসম, কৃতান্ত, পারীয়া সমান, পঞ্চভূত।

৮। উদ্ধৃত কবিতাটি থেকে পাঁচটি স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দ খুঁজে বের কর।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) ঃ

(ক) কামিনী রায় ছাড়া আরও অন্ততঃ একজন বিখ্যাত মহিলা-কবির নাম বলো।

(খ) উদ্ধৃত কবিতাটিতে স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির কী পরিচয় মেলে ?

[প্রখ্যাত ছন্দ-বিশারদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খ্রীঃ) বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। ছন্দে বৈচিত্র্য তাঁর কবিতার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আগ্রহী এই স্বদেশপ্রেমিক কবি বিভিন্ন বিদেশী কবিতা অনুবাদের মাধ্যমেও বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬ খ্রীঃ), 'হোমশিখা' (১৯০৭ খ্রীঃ) এবং কবিতা-সংকলন 'কাব্য সঞ্চয়ন' (১৯৩০ খ্রীঃ)।]

ছিপখান তিন-দাঁড়— তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর ভ্যায় দূর পাল্লা।
কঞ্চির তীর-ঘর ঐ চর জাগছে,
বন-হাঁস ডিম তার শ্যাওলায় ঢাকছে।
চুপ চুপ—ওই ডুব ভ্যায় পানকৌটি,
ভ্যায় ডুব টুপ টুপ ঘোমটার বউটি।
রূপশালি ধান বুঝি এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ি তার হাসি মিষ্টি।
মুখখানি মিষ্টি রে চোখ দুটি ভোমরা
ভাব কদমের—ভরা রূপ ভ্যাখো তোমরা।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালি-ধান-ভানা রূপ ত্যাখো তোমরা।

[সংক্ষেপিত]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

ছিপ—সরু দ্রুতগামী নৌকা। দাঁড়—নৌকাদণ্ড।
মাল্লা—নৌকাদির চালক। চৌপর—চারি প্রহর কাল, সমস্ত দিন বা রাত।
কঞ্চি—বাঁশের ডাল। চর—নদীগর্ভে বা নদীকূলে স্রোত দ্বারা উৎপন্ন বালুকাময় স্তর।
ধূপছায়া শাড়ি—লাল সুতার টানা ও কালো নীল বা বেগুনি সুতার পড়েন দিয়ে বোনা কাপড়।
ভোমরা—ভ্রমর-এর কথ্য রূপ।

অনুশীলনী

১। কারা কীভাবে দূরের দেশে পাল্লা দিচ্ছে? ওরা চরে কী দেখল? জলে ও ডাঙ্গায় ওরা আর যা যা দেখেছে, বলো।

২। এই কবিতায় গ্রাম-বাংলার যে ছবি ফুটেছে, তার পরিচয় দাও।

৩। "ধূপছায়া যার শাড়ি/তার হাসি মিষ্টি।"—কাকে উদ্দেশ্য করে কোথায় এ-কথা বলা হয়েছে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বুঝিয়ে দাও।

৪। 'দূরের পাল্লা' কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখ।

৫। কবিতাটির প্রথম বারো পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

৬। ব্যাখ্যা কর: (ক) রূপশালি···মিষ্টি। (খ) মুখখানি·· ত্যাখো তোমরা। (গ) পান বিনে···তোমরা।

৭। টীকা লিখ: ছিপখান তিন-দাঁড়, কঞ্চির তীর-ঘর, রূপশালি ধান।

৮। কবিতাটি থেকে তিনটি বিশেষণ ও দু'টি সমাসবদ্ধ পদ খুঁজে বের কর।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):

(ক) 'দূরের পাল্লা' কবিতাটি তোমার কেন ভালো লাগে?

(খ) হাঁটা-পথে, নৌকায় বা ট্রেনে যাবার সময় তোমার নিজের দু'একটি অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা কর।

[বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রীঃ) সর্বহারা, পীড়িত ও লাঞ্ছিত মানুষের কবি হিসেবে জনগণবন্দিত। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় সাম্যবাদের সুর ; অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দীপ্ত বাণী। তাঁর কাছে মানুষই ঈশ্বর ; নিজের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করলেই মানুষকে ভালোবাসা সম্ভব হয়।]

কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে'
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে ?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মাণিকে বুকে ধ'রে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খোঁজো—আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে ;
ইচ্ছা-অন্ধ ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ-কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠো না, শাস্ত্রবিদেরে ক'রোনাক বীর, ভয়—
তাহারা খোদার খোদ্ "প্রাইভেট সেক্রেটারী" ত নয় !

সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি !
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি !
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে—
রত্নাকরের খবর তা ব'লে পুছো না ওদেরে ভুলে'
উহারা রত্ন-বেণে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে !
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে ।

[সাম্যবাদী]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

জগদীশ—বিশ্বপতি, পরমেশ্বর, নারায়ণ। পাহাড়-চূড়ে—পর্বত-শিখরে। দরবেশ—মুসলমান সন্ন্যাসী, ফকির। অবয়ব—অঙ্গ। রত্নাকর—সমুদ্র।

অনুশীলনী

১। "বুকের মাণিকে বুকে ধ'রে তুমি খোঁজ তারে দেশ-দেশ।"—'বুকের মাণিক'টি কে? তাঁকে কারা কীভাবে খুঁজছে? এই খোঁজার মধ্যে কী ধরনের ত্রুটি আছে?

২। "রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে!"—কোন্ প্রসঙ্গে কোথায় এই মন্তব্য?—মূল কবিতা অনুসরণ করে মন্তব্যটির সারবত্তা বুঝিয়ে দাও।

৩। 'ঈশ্বর' কবিতায় শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্ সম্পর্কে কবির বক্তব্য কী? সত্য-সিন্ধু-জল বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

৪। কবিতাটির মর্মকথা নিজের ভাষায় লিখ।

৫। কবিতাটির প্রথম দশ পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

৬। প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) হায় ঋষি···দেশ-দেশ। (খ) শিহরি···নয়! (গ) উহারা ···রত্নাকরেও চেনে।

৭। অর্থ বলো :

জগদীশ, দর্পণ, অবয়ব, রত্নাকর।

৮। নিম্নোক্ত পদগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

আকাশ, বীর, সত্য, তল, জল।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :

(ক) 'ঈশ্বর' কবিতাটি পড়ে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয় ?

(খ) নজরুল ইসলামকে 'বিদ্রোহী কবি' বলা হয় কেন? 'ঈশ্বর' কবিতায় কবির বিদ্রোহী মনোভাবের কী পরিচয় পাও ?

বাংলার রূপ

জীবনানন্দ দাশ

[জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪ খ্রীঃ) এ-যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, তাঁর কাব্য 'চিত্ররূপময়'। জীবনানন্দ সম্পর্কে কবিগুরুর এই উক্তি যে কতখানি খাঁটি তার পরিচয় এই কবিতাটিতেও মিলবে। 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৭ খ্রীঃ) নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ থেকে এ-কবিতাটি সংকলিত।]

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েলপাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট– কাঁঠালের—হিজলের—অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—

সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

[রূপসী বাংলা]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

ডুমুর—ডুমুর ফল [ডুমুরের ফলের ভিতরেই ফুল থাকে বলে লোকে ডুমুরের ফুল দেখতে পায় না। এ থেকেই 'ডুমুরের ফুল' কথাটি এসেছে]

দয়েল—দুই ধারে দধিবৎ শ্বেত-চিহ্নের বিশেষত্ব-হেতু পাখিটির এই নাম।

শটি—গন্ধমূলী।

চাঁদ—চন্দ্রধর, মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র—চম্পকনগরের বিজয় সাধুর পুত্র—চাঁদ সদাগর।

চম্পার কাছে—চম্পকনগরের ঘাটের কাছে।

বেহুলা—চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের স্ত্রী।

গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—মনসার কোপে সর্পদংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হয়। তখন তার মৃতদেহ কলার মান্দাসে (ভেলায়) স্থাপন করে গাঙুড় নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ওদিকে স্বামীর শবদেহ কোলে নিয়ে ভেলায় উঠে বসে বেহুলা। স্বামীকে যেমন করে হোক সে বাঁচিয়ে তুলবে।

একদিন অমরায় গিয়ে—অনেক দুঃখকষ্ট ভোগের পর অবশেষে বেহুলার ডাক পড়ল স্বর্গের দেব-সভায়। সেখানে মনোহারিণী নৃত্যে সে দেবতাদের হৃদয় জয় করল। তখন শিবের অনুরোধে মনসা বেহুলার স্বামী লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন।

খঞ্জনা—একজাতের ক্ষুদ্র পাখি। এরা ছিপ ছিপে, এদের ঠোঁট পুরু, পা সরু ও লম্বা, ডানা মাঝারি, পুচ্ছ বড়। এরা স্বভাবতঃই চঞ্চল।

অনুশীলনী

১। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,"—কবি কী কী দেখেছেন, সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলো।

২। কবি পৃথিবীর রূপ খুঁজতে যান না কেন? এ-সম্পর্কে তাঁর কৈফিয়ৎ কী?

৩। "ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়।"—ছিন্ন খঞ্জনা কী? কার নাচের কথা এখানে বলা হয়েছে? এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য কী?

৪। 'বাংলার রূপ' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বাংলার যে সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন, সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

৫। 'বাংলার রূপ' কবিতাটি থেকে এমন কয়েকটি শব্দ খুঁজে বের কর যেগুলি বাংলার রূপ ফুটিয়ে তোলার কাজে সাহায্য করেছে।

৬। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৭। প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) মধুকর ডিঙা থেকে…দেখেছিল; (খ) ছিন্ন খঞ্জনার… কেঁদেছিল পায়।

৮। টীকা লিখ ঃ

ডুমুর গাছ, দয়েলপাখি, হিজল, শটিবন, তমাল, বেহুলা, গাঙুড়, শ্যামার নরম গান, ছিন্ন খঞ্জনা, ভাঁটফুল।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) ঃ

(ক) জীবনানন্দ দাশের সমসাময়িক অন্ততঃ দু'জন আধুনিক কবির নাম বলো।

(খ) বাংলার সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

কালো মেয়ে

জসীমউদ্দীন

[সরল ভাষায় পল্লী-বাংলার খাঁটি চিত্র অংকনে জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬ খ্রীঃ) সিদ্ধহস্ত। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' থেকে সংকলিত এই কাব্যাংশটিতে জসীমউদ্দীন-এর এই সিদ্ধির পরিচয় মিলবে।]

ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই,
ফুল ঝুর ঝুর করে ;
দেখে এলাম কালো-মেয়ে গদাই নমুর ঘরে।
ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পাশে টিয়া ;
নমুর মেয়ে গা মাজে রোজ তারির পাখা দিয়া।
দূর্বাবনে রাখ্‌লে তারে দূর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।
লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা, রৌদ্রেতে যায় উনে' ;
গা-ভরা তার সোহাগ দোলে এই কথাটি শুনে'।
যে পথ দিয়ে যায় চলে সে, যে পথ দিয়ে আসে,
সে পথ দিয়ে মেঘ চলে যায়, বিজলী বরণ হাসে।

বনের মাঝে বনের লতা পাতায় পাতায় ফুল,
সেও জানে না নমু মেয়ের শ্যামল শোভার তুল।
যে মেঘেরে জড়িয়ে ধরে হাসে রামের ধনু,
রঙিন শাড়ী হাসে যে তার জড়িয়ে সেই তনু।

গায়ে তাহার গয়না নাহি, হাতে কাচের চুড়ী ;
দুই পাশেতে কাঁশার খাড়ু বাজছে ঘুরি ঘুরি।
এতেই তারে মানিয়েছে যা তুলনা নেই তার ;
যে দেখে সে অমনি বলে, দেখে লই আরবার।
সোনা রূপোর গয়না তাহার পরিয়ে দিলে গায়
বাড়ত না রূপ, অপমানই করতে হ'ত তায়।
ছিপ ছিপে তার পাতলা গঠন, হাত চোখ মুখ কান
দুলছে হেলছে মেলছে গায়ে গয়না শতখান।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট : প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, দ্বিতীয় সংস্করণ (আশ্বিন ১৩৪৮) থেকে গৃহীত।]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

উনে—কমে। সোহাগ—আদর।
রামের ধনু—রামধনু (মেঘ থেকে পতিত জলকণাসমূহ সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আকাশে যে বিচিত্রবর্ণ সুবৃহৎ ধনুকাকার প্রতিবিম্ব রচনা করে)।
খাড়ু—বলয়বিশেষ।

অনুশীলনী

১। 'কালো মেয়ে'টি কোথায় থাকত? কার ঘরে? তার বসন-ভূষণ, আচার-আচরণ ও চেহারা কি ধরনের ছিল?

২। "যে দেখে সে অমনি বলে, দেখে লই আরবার।"—কাকে উদ্দেশ্য করে কোথায় এই উক্তি—প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক বুঝিয়ে দাও।

৩। 'কালো মেয়ে' কবিতায় সহজ-সরল পল্লী-নারীর যে ছবি ফুটে উঠেছে, সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

৪। 'কালো মেয়ে' কবিতায় বাংলার নিজস্ব রূপ কীভাবে ফুটে উঠেছে, বলো।

৫। কবিতাটির শেষ আট পঙ্‌ক্তি মুখস্থ লিখ।

৬। প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক ব্যাখ্যা কর :

(ক) দূর্বাবনে···দিশে। (খ) যে মেঘের···সেই তনু। (গ) সোনা রূপোর···হ'ত তায়।

৭। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

ঘর, রৌদ্র, অপমান।

৮। প্রশ্ন (মৌখিক) :

কবি জসীমউদ্দীন-এর বর্ণিত কালো মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগে, বুঝিয়ে বলো।

সিঁড়ি

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭ খ্রীঃ) নামটির সঙ্গে বাঙালীর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জড়িত। অতি অল্প বয়সে এই কবির তিরোধান ঘটে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর তরুণ বয়সে লেখা কবিতার মধ্যেও সত্যিকারের পরিণতির ছাপ। প্রগাঢ় মানবপ্রেম ও নিবিড় স্বদেশপ্রীতি সুকান্তের রচনার বৈশিষ্ট্য। সংকলিত কবিতাটিতে আমরা তাঁর বিদ্রোহী কবিসত্তার ও ঐকান্তিক মানবপ্রীতির পরিচয় পাই।]

আমরা সিঁড়ি,
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে ;
তোমাদের পদধূলি-ধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায় প্রতিদিন—

তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত
ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে

আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত, অত্যাচারী পদধ্বনি

তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন॥

[ছাড়পত্র]

॥ শব্দ-ভাণ্ডার ও টীকা-টিপ্পনী ॥

পদাঘাত—পায়ের দ্বারা প্রহার, লাথি। গর্বোদ্ধত—অহঙ্কারের দ্বারা স্পর্ধিত। হুমায়ুন—বাবরের পুত্র, ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দিল্লীর পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আকস্মিকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়—১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। পদস্খলন—পিছলে পড়া।

অনুশীলনী

১। 'সিঁড়ির' বেদনা কোথায়? আমরা সিঁড়ির প্রতি কী অবিচার করি? এই অবিচারের পরিণতি কী?

২। "একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন।"—প্রসঙ্গ নির্দেশ-পূর্বক কবির এই উক্তির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

৩। 'সিঁড়ি' কবিতায় কবির মূল বক্তব্য কী?—নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৪। কবিতাটির প্রথম দু'টি স্তবক মুখস্থ লিখ।

৫। ব্যাখ্যা লিখ: (ক) তোমাদের পদধূলি-ধন্য···প্রতিদিন—
(খ) আর সম্রাট···পদস্খলন।

———